উপন্যাস সিরিজ।
সুদের সুদ
শ্রীনারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
বাসন্তী
শ্রীকালীপ্রসন্ন
রাজপুতের মেয়ে
কমলিনী - সাহিত্য - মন্দির
১১৪ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
১, একটাকা - সংস্করণ।
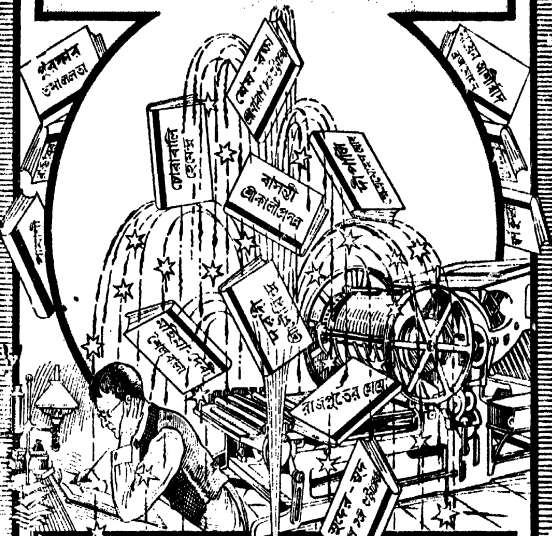
প্রকাশক—
শ্রীগোষ্ঠবিহারী দত্ত।
শ্রীশরৎচন্দ্র পাল।

'কমলিনীসাহিত্য মন্দির'
১৪নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

B. DUTT S. C. PAUL

কান্তিক প্রেস,
প্রিণ্টার—শ্রীকালাচাঁদ দালাল।

উপহার

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

Ray & Sons, Calcutta
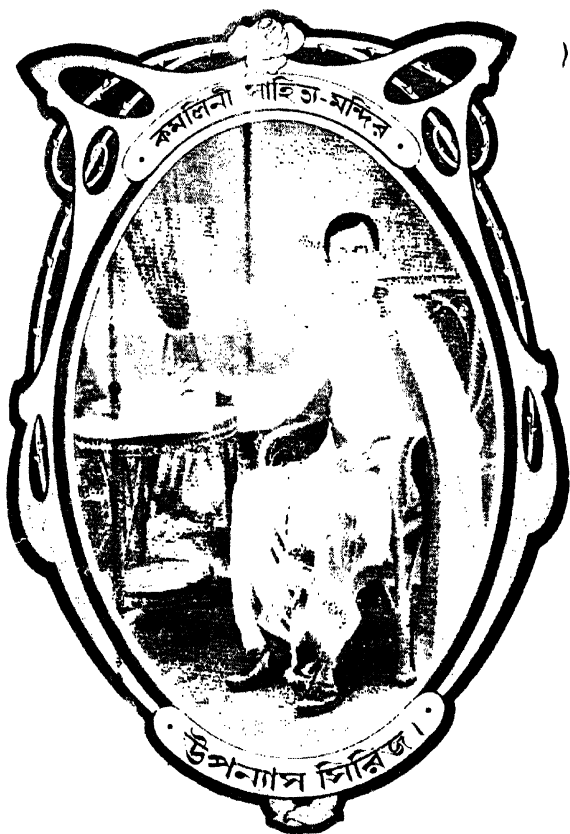
সাহিত্য-গগনের কোন্ কোন্ উজ্জ্বল নক্ষত্র কমলিনী-

সাহিত্য-মন্দিরের কীর্ত্তিধ্বজা আলোকিত করিতেছেন তাহাই দেখুন—

শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী।	শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী।
„ ইন্দিরা দেবী।	„ শৈলবালা ঘোষজায়া।
„ প্রভাবতী দেবী।	„ তমাললতা বসু।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

„ হরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

„ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ।

„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি-এ।

„ নারায়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

„ কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত এম-এ।

„ সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল্।

„ নবকৃষ্ণ ঘোষ বি-এ।

„ হেমেন্দ্রকুমার রায়।

„ ক্ষেত্রমোহন ঘোষ।

„ বিভূতিভূষণ ভট্ট বি-এল্।

„ গিরিজাকুমার বসু।

„ নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

„ প্রফুল্লচন্দ্র বসু।

„ প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়।

„ শরৎচন্দ্র পাল (পরিচালক)

„ ব্রজমোহন দাস।

প্রতি মাসের ১লা তারিখে সাহিত্যজগদ্বরেণ্য উল্লিখিত সুলেখক লেখিকাবৃন্দের একখানি করিয়া মনোমদ উপন্যাস আপনাদের হাতে দিতে পারি।

শ্রীগোষ্ঠবিহারী দত্ত
শ্রীশরৎচন্দ্র পাল } (কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির)

সুদের সুদ

১

সুদের সুদ তস্য সুদে কাঠের সিন্দুকটা যখন খুব ভারী হইয়া আসিল, এবং পাকা চুলগুলা অচিরাৎ যে এক দূরদেশে যাইবার সম্ভাবনা জানাইয়া দিতেছিল সেই সুদূরবর্ত্তী দেশে এই ভারী সিন্দুকটা লইয়া যাইবার কোন উপায় দেখা গেল না, তখন বেলপুকুরের রামগোবিন্দ দত্ত এই সুদের সুদগুলার জন্য বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। সুদ আসল সমেত এই সিন্দুকটা যাহাদের হাতে দিয়া যাত্রা করিতে পারা যাইত, তাহারা অনেক আগেই সেই সুদূরদেশে চলিয়া গিয়াছিল, দত্তজা একাই শুধু পশ্চাতে পড়িয়াছিলেন। সংসারে নিজেকে ছাড়া আপনার বলিতে আর কাহাকেও দেখিতে পাইতেন না; বিস্তৃত প্রান্তর মধ্যে বজ্রদগ্ধ বিটপীটা যেমন শাখাপল্লবশূন্য, রসহীন, ছায়াহীন হইয়া রৌদ্রদগ্ধ আকাশতলে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, দত্তজাও সেইরূপ সংসারে স্নেহমমতাশূন্য প্রীতি ও ভালবাসার সম্পর্ক হইতে বিচ্ছিন্ন জীবনটা লইয়া অনির্দ্দিষ্ট শেষের দিনটার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; এবং

সে দিনটা যতই নিকটবর্ত্তী বলিয়া বুঝিতে পারিতেছিলেন, ততই সুদের সুদগুলার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িতেছিলেন।

পরিজনের মধ্যে ছিল ভৃত্য ভজহরি। সে কৈবর্ত্তের ছেলে, অনেক দিনের চাকর। সে গরুর সেবা করিত, সুদের তাগাদা করিতে যাইত, মনিবের তামাক সাজিত, আর পরামর্শের প্রয়োজন হইলে খুব বিজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় কর্ত্তাকে পরামর্শ প্রদান করিত। তাহার সকল পরামর্শই যে গৃহীত হইত তাহা নহে, তবে সে মাঝে মাঝে এমন দুই একটা পরামর্শ দিত যে, দত্তজা তাহাকে একেবারে উপেক্ষা করিতে পারিতেন না; এবং ভজহরির সম্মুখে তাহার পরামর্শকে নিতান্ত অসার বলিয়া প্রকাশ করিলেও তদনুরূপ কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ইহাতে ভজহরি স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়া বলিত, "দেখলে কর্ত্তা, গরীবের কথা বাসি হ'লেই মিঠে লাগে।"

দত্তজা যেন বিরক্তির সহিত উত্তর করিতেন, "হাঁ হাঁ, তুই আবার মানুষ, তোর আবার কথা!"

তাহার পরামর্শের সাফল্য দর্শনেও কর্ত্তা যে তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন ইহাতে ভজহরি মনে মনে দুঃখ অনুভব করিত, কিন্তু সুযোগ পাইলে পুনরায় পরামর্শ দিতে ছাড়িত না।

এ হেন পরামর্শদাতা ভজহরি যখন দেখিল যে, সুদের সুদ-গুলার জন্য কর্ত্তা বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন, তখন সে একদিন পরামর্শ দিল, "এক কাজ কর কর্ত্তা, এসব বেচে কিনে কাশী কি বিন্দাবনে চল।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দত্তজা বলিলেন, "চুলোয় যাব। বেচবো কিনবো কি? এ সব দিয়ে যাব কা'কে?"

চিন্তিতভাবে মস্তক সঞ্চালন করিতে করিতে ভজহরি বলিল, "দেবে আর কা'কে কত্তা, দেবার আর আছে কে? তবে সাথে ক'রেও তো নিয়ে যেতে পারবে না। তার চাইতে দান ধ্যান কত্তে পার।"

মুখ খিঁচাইয়া দত্তজা বলিলেন, "তোর গুষ্টীর মাথা কত্তে পারি। দান করবো কা'কে? তোকে দেব? তুই নিবি?"

ভজহরি হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল; হাসিতে হাসিতে বলিল, "কও কথা কত্তা, আমি হই জাতে কৈবত্ত, আমাকে তুমি দিতে যাবে কেনে? আর দিলেই বা পুণ্যি ধম্ম হবে কেনে? আমার কথা কি কইচি, দেবতা আছে, বামুন আছে, যাদের দিলে পরকালের কাজ হবে।"

তীব্রকণ্ঠে দত্তজা বলিলেন, "তোকে বলেছে হবে। গায়ের রক্ত জল ক'রে দু'পয়সা জমিয়েছি, তার উপর বেটাদের শকুনির মত নজর পড়েছে। কত বেটা যে আমার মরণ টেঁকে আছে তাকি আমি জানি না? মরবো যেন একা আমি, আর কোন বেটাই মরবে না।"

কর্ত্তার রাগ দেখিয়া ভজহরি সঙ্কুচিত ভাবে মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে লাগিল। দত্তজা মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "বেটারা নিজে পিপড়ে টিপে গুড় খায়, আর পরের বেলায় যুক্তি দেয়, দান কর, বিলিয়ে দাও। ইঃ, বিলিয়ে দিলেই হ'লো আর কি।

এই আমি বলছি ভজা, জান থাকতে গোবিন্দ দত্ত কাউকে এক পয়সা দিতে পারবে না, তা তিনি বামুনই হোন, আর দেবতাই হোন।"

অর্থপ্রিয় গোবিন্দ দত্তের এই উক্তির মধ্যে অসম্ভব বলিয়া যে কিছুই নাই সে বিষয়ে ভজহরির বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। সুদের সুদের একটী পয়সা ছাড়িতে বলিলে যিনি খাতকের পায়ে মাথা কুটিতে উদ্যত হন, এক একটী পয়সাকে যিনি দেহের এক এক বিন্দু রক্ত বলিয়া জ্ঞান করেন, তিনি যে টাকা পয়সা দান করিতে পারিবেন এমন অসম্ভব আশা ভজহরি কখনও করে নাই। তথাপি প্রভুর মঙ্গল কামনাতেই ভজহরি তাঁহাকে সু-পরামর্শ দিতে অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু কর্ত্তা যখন সে পরামর্শ কাণে তুলিলেন না, অধিকন্তু রাগিয়া উঠিলেন, তখন অগত্যা তাহাকে নিরস্ত হইতে হইল, এবং এই ভূতের পয়সা যে ভূতে খাইবে ইহা নিশ্চিত ধারণা করিয়া লইল।

ভজহরি কিন্তু এটা ধারণা করিতে পারিল না যে, তাহার প্রদত্ত পরামর্শকে দত্তজা ক্রোধ ও বিরক্তি দিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিলেও সেটা তাঁহার মনের ভিতর এমন একটা দাগ বসাইয়া দিল, যাহাকে তিনি কোনরূপ কঠোরতা দিয়াই মুছিতে পারিলেন না। মূর্খ ভজার আর সকল কথা উপেক্ষা করিলেও একটা কথা তিনি কিছুতেই ঠেলিতে পারিলেন না—"দেবার আর আছে কে? তবে সাথে ক'রেও তো নিয়ে যেতে পারবে না।" সত্যই তো, সঙ্গে কিছুই যাইবে না। একা নগ্ন অবস্থায় আসিয়াছি,

ঠিক সেই অবস্থাতেই যাইতে হইবে ; একখানা পরিধেয় পর্য্যন্ত সঙ্গে লইয়া যাইবার উপায় নাই। তবে এত অর্থ সঞ্চয় করিলাম কেন ? এই সকল সঞ্চিত অর্থের কি গতি হইবে ? ভোগ করিব ? কিন্তু তাহার আর সময় কৈ ? দিনের আলোক ম্লান, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। কাহাকেও দিয়া যাইব ? কাহাকে দিব ? কে আছে ? উঃ, এত বড় সংসার, যেখানে অর্থের জন্য সহস্র সহস্র লোক হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছে, সেখানে এই কষ্টার্জ্জিত অর্থের গ্রহীতার অভাব! সংসারের একি নির্ম্মম পরিহাস ? দত্তজার মনে হইল, এই নির্ম্মম সংসারটাকে ত্যাগ করিয়া তাহার কঠোর পরিহাসের একটা কঠোর প্রতিশোধ দিলে মন্দ হয় না।

দিনকতক ভাবিয়া একদিন তিনি ভজহরিকে বলিলেন, "হাঁ রে ভজা, যদি কাশীবাসই করা যায়, বাড়ীঘরগুলার কি হবে বল্ দেখি ?"

ভজহরি বলিল, "ও কথা কত্তা, তুমি যদি কাশীবাস কর, তোমার ঘর বাড়ীতে আর কি হবে ? দিন কতক পরে সব ভেঙ্গে-চুরে মাঠ হয়ে যাবে।"

দত্তজা যেন অতিমাত্র শঙ্কিতভাবে বলিয়া উঠিলেন, "বলিস কি রে ভজা, এই ঘর দোর সব মাঠ হবে ?"

ভজহরি ঘাড়টা একবার নাড়িয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "তা তুমি কি মনে কর কত্তা, এ সব চেরকাল এই রকম থাকবে ? ঐ যে ঘোষেদের অমন কোঠাবাড়ী, কি রকম বন হ'য়ে গেছে

দেখছো তো। আর রা' ক'রো না কত্তা, তুমি কি চেরকাল ঘর বাড়ী আগলে থাকবে ?"

দত্তজা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলেন। ভজহরি তামাক সাজিয়া আনিয়া হাতে হুঁকা দিল। দত্তজা ধীরে ধীরে হুঁকায় টান দিতে লাগিলেন। পাশের বাড়ীর দরজায় ভিখারী বৈষ্ণব গুপীযন্ত্র বাজাইয়া গাহিতেছিল—

"সাধের খাঁচা পড়ে রবে তোর।
ক্ষেপা ভাঙলো নাকো ঘুমের ঘোর।"

দত্তজা ডাকিলেন, "ভজা!"

ভজহরি গরুর বিচালি কাটিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কর্ত্তার আহ্বানে উত্তর দিল, "কেনে গা কত্তা ?"

দত্তজা বলিলেন, "বৈরিগী ঠাকুরকে ডাক্ তো।"

ভজহরি গিয়া বৈরাগী ঠাকুরকে ডাকিয়া আনিল। দত্তজা তাহাকে বলিলেন, "একটা গান গাও তো ঠাকুর!"

ভিখারী গান ধরিল,—

"হরি বল মন রসনা, দিন তো ব'য়ে গেল রে।"

ভ্রূকুটী করিয়া দত্তজা বলিলেন, "হরি বললেই দিনটা বসে থাকবে না কি!"

বৈরাগী থামিয়া গিয়া তাঁহার মুখের দিকে ভীতিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। দত্তজা বলিলেন, "ও বাড়ীতে যে গানটা গাইছিলে সেইটা গাও।"

ভিখারী পুনরায় গুপীযন্ত্র বাজাইয়া গাহিল—

"সাধের খাঁচা পড়ে রবে তোর।
ক্ষেপা ভাঙলো নাকো ঘুমের ঘোর।
যখন খাঁচা পত্তন করেছে,
পালাবার পথ রেখে ঘরে বসত করেছে,
ক্ষেপা সিঁধ কাটিতে দুয়ার কেটে
ঘরের ভিতর ঢুকবে চোর।"

দত্তজার ললাট কুঞ্চিত হইল। বৈরাগী গাহিতে লাগিল—

"ভাই বন্ধু মাতা পিতাতে,
বত্তি এনে বসাইবে তোর চারিভিতে,
তোর ঘড় ঘড় ঘড় করবে গলা
তখন হবে বাজি ভোর।"

দত্তজা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং ঘরের ভিতর হইতে একটা পয়সা আনিয়া ভিখারীর দিকে ছুড়িয়া দিলেন। ভিখারী পয়সা কুড়াইয়া লইয়া দাতার জয়গান করিতে করিতে প্রস্থান করিল; আর ভজহরি কর্ত্তার এই অপূর্ব্ব দানশক্তিদর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বৈরাগী ঠাকুরের অদৃষ্টের প্রশংসা করিতে লাগিল।

শীঘ্রই গ্রামে প্রচার হইয়া গেল, বৃদ্ধ মহাজন রামগোবিন্দ দত্ত খাতকালির হিসাব নিকাশ শেষ করিয়া পরলোকের হিসাব নিকাশে প্রস্তুত হইবার জন্য সত্বর কাশী যাত্রা করিতেছেন। শুনিয়া অনে[illegible] আশ্চর্য্যান্বিত হইল, অনেকে দত্তজার ধর্ম্মনিষ্ঠার প্রশংসা [illegible]ল; খাতকদের মধ্যে কেহ কেহ সুদ রেহাই পাইবার

আশা পাইয়া আনন্দিত হইল, কেহ বা অবিলম্বে আসলের টাকা পরিশোধ করিতে হইবে ভাবিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িল। বুদ্ধিমানেরা স্থির করিল, কাশীযাত্রা ভাণ মাত্র, বুড়া এবার টাকাগুলা হাত করিয়া যথ দিবে। নির্ব্বোধেরা ভাবিয়া লইল, বুড়ার মরিবার আর বিলম্ব নাই, সেই জন্যই ধর্ম্মপথে মন দিয়াছে।

দত্তজা কিন্তু কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন, এবং খাতাপত্র, তমশুক, হাতচিঠি প্রভৃতি লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

২

"দাদামশায়!"

"কেন গা কৈলাসমণি?"

"তুমি নাকি কাশী যাবে?"

"মনে তো তাই কচ্চি; তার পর কাশীনাথের মরজি।"

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত খাতাপত্রগুলার মাঝখানে কৈলাসী থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল, এবং একখানা খাতার পাতা উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা দাদামশায়, কাশী গেলে কি হয়?"

"পাপের ক্ষয় হয়।"

"তবে না কাশীতে মলে শিব হয়?"

"শিব হয়, গাধাও হয়।"

"তুমি কি হবে? শিব না গাধা?"

"খুব সম্ভব গাধাই হব।"

কৈলাসী হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। দত্তজা নাকের উপর হইতে চশমাটা খুলিয়া কোঁচার খুঁট দিয়া তাহা মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "হাসলি যে? আমি গাধা হলে তোর খুব আমোদ হয়, না?"

হাসি চাপিয়া কৈলাসী বলিল, "কক্ষনো না দাদামশায়। আমার দাদামশায় তুমি, তুমি যে ঘাস খাবে, কাপড়ের মোট বইবে, তাতে আমার একটুও আমোদ হবে না।"

তাহার মুখের দিকে সহাস্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দত্তজা বলিলেন, "কিসে তোর আমোদ হয়? শিব হলে?"

ঘাড় নাড়িয়া কৈলাসী বলিল, "তা হয়।"

দত্তজা বলিলেন, "তা হলে তুই পূজো ক'রে আমার কাছে বর চাইবি?"

"হুঁ"

"কিন্তু আমি কি বর দেব জানিস্?"

"কি দেবে?"

"তোর বুড়ো বর হোক, এই বর দেব।"

"নিজে বুড়ো বলে বুঝি?"

"তা নইলে বুড়োর উপর এত দরদ হবে কেন?"

বলিয়া দত্তজা হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন। কৈলাসী হাসিমুখে খাতাখানা উল্‌টাইতে লাগিল। দত্তজা পুনরায় চশমা চোখে লাগাইয়া হিসাবে মনোনিবেশ করিলেন।

এমন সময় শ্রীদাম পাল উপস্থিত হইয়া দত্তজাকে নমস্কার করিল এবং তালপাতার চাটাইখানা টানিয়া একপাশে বসিল। দত্তজা মুখ তুলিয়া গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে ছিদাম, খবর কি ?"

শ্রীদাম উত্তর দিল, "এই আপনকার কাছে আসচি কত্তা।"

দত্তজা বলিলেন, "আসচো যে তাতো বুঝতেই পাচ্চি। টাকা এনেছ ?"

শ্রীদাম মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে বলিল, "আজ্ঞে কর্ত্তা—"

বিকৃতমুখে দত্তজা বলিলেন, "আজ্ঞে কি, এই দেখ তোমার হিসাব, তিন দফায় সতের টাকা নিয়েছ, সুদ হয়েছে সাড়ে ষোল টাকা। কিন্তু সুদ যখন ছেড়ে দিচ্চি তখন আমার আসল টাকা ফেলে দাও।"

মাথা নাড়িয়া শ্রীদাম বলিল, "তা দেব বই কি কত্তা। আপনি হচ্চো মহাজন—"

বাধা দিয়া দত্তজা বলিলেন, "ও সব ছেঁদো কথা রেখে দাও। আজ হচ্চে সাতুই, একুশের মধ্যে আমার টাকা চাই। পঁচিশে উত্তম দিন আছে; সোমবার ত্রয়োদশী পুষ্যা নক্ষত্র। সর্ব্বসিদ্ধি ত্রয়োদশী, তার উপরে 'শত দোষ হরে পুষ্যা'। ঐ দিনে আমাকে বেরুতেই হবে। তোমাদের তিন পয়সা সুদের আশায় পড়ে থাকলে তো চল্‌বে না ? পরকালটা তো রাখতে হবে।"

বিজ্ঞভাবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া শ্রীদাম বলিল, "সে কথা

আর দু'বার বল্‌তে কর্ত্তা। কথাতেই আছে—ধন বড় না ধর্ম্ম বড়। ধর্ম্মকর্ম্ম না করলে পরকালে কি হবে।"

দত্তজা বলিলেন, "সেই তরেই বল্‌ছি, আমার যে দু'দশ টাকা পাওনা আছে সব ফেলে দাও। ধর, সময়ে হাত পাততেই পেয়েছ, এখন আমার অসময়, আমাকে না দিলে চল্‌বে কেন?"

শ্রীদাম চিন্তিত ভাবে বলিল, "তাও কি চলে। তবে কর্ত্তা, সময়টা বড্ড খারাপ, টাকা তো কোথাও পাচ্চি না। গাই গরুটা বেচে সাড়ে এগারটী টাকার যোগাড় করেছি, এই নিয়ে যদি—"

দত্তজার কঠোর দৃষ্টিপাতে ভীত হইয়া শ্রীদাম চুপ করিয়া গেল। দত্তজা গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "আমাকে সব পাগল পেয়েছ বটে! সুদ ছেড়েছি, এবার আসল ছেড়ে দাও। আমি এক পয়সা ছাড়বো না, সুদের সুদ হিসেব ক'রে নেব। তাতে আমার কাশী যাওয়া হোক চাই না হোক।"

ভয়ে শ্রীদামের মুখ শুকাইয়া গেল। দত্তজা ক্রোধসমুচ্চ-কণ্ঠে বলিলেন, "সাত দিনের মধ্যে আমি বেবাক টাকা চাই। যে বেটার একটি পয়সা বাকী থাকবে, তার ঘটি বাটি পর্য্যন্ত যদি বেচে না নিই তবে—"

সম্মুখের দিকে চাহিয়া দত্তজা থামিয়া গেলেন। একটী সতের আঠার বছরের ছোকরা, গায়ে গেঞ্জী, বগলে ছাতা, হাতে জুতা, পায়ের হাঁটু পর্য্যন্ত ধূলা মাখা, সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং দত্তজার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এই কি রামগোবিন্দ দত্তের বাড়ী?"

দত্তজা বলিলেন, "তোমার নিবাস ?"

"রাইপুর।"

"নাম ?"

"শ্রীমাণিকচন্দ্র রায়।"

"বাপের নাম ?"

"৺হরলাল রায়।"

দত্তজা চশমার ভিতর দিয়া তীব্রদৃষ্টিতে মাণিকলালের দিকে চাহিলেন। মাণিকলাল জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নাম বুঝি রামগোবিন্দ দত্ত ?"

দত্তজা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই শ্রীদাম বলিয়া উঠিল, "হাঁ হাঁ, এনারি নাম দত্ত মশায়।"

মাণিকলাল জুতা ফেলিয়া, ছাতাটা রাখিয়া দত্তজার পায়ের কাছে উপুড় হইয়া প্রণাম করিল, এবং তাঁহার পায়ের ধুলা লইয়া মাদুরের উপর খাতা পত্রের মাঝখানে কৈলাসীর পাশে ধুপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। কৈলাসী গায়ে মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া, একটু সরিয়া বসিল।

মাণিকলাল বেশ চাপিয়া বসিয়া কোঁচার খুঁট খুলিয়া বাতাস খাইতে খাইতে বলিল, "উঃ, বেজায় রোদ, তায় অচেনা রাস্তা। রাস্তাও তো কম নয়, পাকা ছ'টী কোশ।"

শ্রীদাম ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না না, ছ'কোশ হবে কেন ? রাইপুর তো, এখান থেকে জোর কোশ চারেক হবে।"

ক্রুদ্ধভাবে মাণিকলাল বলিল, "হাঁ হবে! কোথায় রাইপুর,

আর কোথায় নলহাটী! নলহাটী এখান থেকে কত রাস্তা হে! দু'কোশ, না চার কোশ?"

অপ্রতিভ ভাবে শ্রীদাম বলিল, "নলহাটী—হাঁ, তা হবে বৈকি; ছকোশ না হোক, পাঁচ কোশ সাড়ে পাঁচ কোশ হবে।"

তীব্রস্বরে মাণিকলাল বলিল, "পাঁচ কোশ? ছ' কোশের যদি এক ইঞ্চি কম হয়, তবে আমি কি বলি।"

বলিয়া সে মাদুরের উপর জোরে একটা চাপড় মারিল। দত্তজা তাহার এই বাচালতায় যেন বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি দরকারে আসা হয়েছে?"

এই প্রশ্নে যেন অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া মাণিক দত্তজার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "দরকার? দরকার তো কিছুই নাই। তবে এখানে সেখানে ঘুরে মনে হলো দাদা মহাশয়কে কখন দেখি নাই, একবার দেখে আসি।"

তাহার মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া একটু ভাবিয়া দত্তজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি রাজুর ছেলে?"

মাণিক বলিল, "ওঃ, আপনি তা হ'লে এতক্ষণ চিনতেই পারেন নি? হাঁ মায়ের নাম রাজুই ছিল বলে শুনেছি। শুনেছি এই পর্য্যন্ত, চোখে দেখি নাই, দেখলেও মনে পড়ে না। আর আপনাকেও তো কখন দেখি নাই; শুধু শুনতাম বেলপুকুরে মায়ের মামার বাড়ী, আর রামগোবিন্দ দত্ত মায়ের মামা।"

বলিয়া সে কৈলাসীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। এক ঘটী জল দাও দেখি।"

কৈলাসী উঠিয়া জল আনিতে ঘরে ঢুকিল। দত্তজা তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সিকের হাঁড়ীতে বাতাসা আছে, দু'খানা নিয়ে আয়। দু'পুর বেলা, শুধু জলটা খেতে নাই।"

অতঃপর তিনি মাণিকের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "খাওয়া দাওয়া হয়েছে?"

মাণিক বলিল, "কও কথা দাদামশায়, সকালে নলহাটী থেকে বেরিয়েছি, এর মধ্যে খাওয়া হবে কোথায়? রাস্তায় বড্ড তেষ্টা পেয়েছিল, এক বেটা চাষার আকের ক্ষেত হ'তে এক গাছা আক ভেঙ্গে নিয়ে খেয়েছি। তাই কত হাঙ্গামা; কে জানতো যে চাষা বেটা কাছেই রয়েছে। আক ভাঙ্গার শব্দ শুনে বেটা ছুটে এসে এই মারে তো এই মারে। কে তুমি, কেন আক ভাঙ্গলে, বেটা যেন জেলার হাকিম। তা বেটার পিঠে এক ঘা আকের বাড়ী দিয়ে তার কথার তো জবাব দিলাম। তারপর দৌড়, দৌড়। এক দমে মাঠ পার হ'য়ে কাণা-নদীতে নেমে পড়ে নিশ্বাস ফেলে বাঁচি। ধত্তে পারলে মেরে হাড় গুঁড়ো ক'রে দিত।"

শ্রীদাম হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। দত্তজা অবাক হইয়া মাণিকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কৈলাসী জল ও বাতাসা আনিয়া দিল। মাণিক জল খাইয়া একটা আরাম সূচক শব্দ করিল।

দত্তজা শ্রীদামকে তামাক সাজিতে আদেশ দিয়া কৈলাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোদের হাঁড়ীতে ভাত আছে রে কৈলাসি?"

মৃদুস্বরে কৈলাসী বলিল, "কি জানি, থাকতেও পারে।"

দত্তজা বলিলেন, "জেনে আয় দেখি। নইলে এমন সময় আবার উনান ধরিয়ে—"

"বোধ হয় ভাত আছে দাদামশায়। আমি জেনে আসছি।"

বলিয়া কৈলাসী চলিয়া গেল। দত্তজা খাতাপত্র গুছাইতে ব্যস্ত হইলেন।

ভজহরি জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাদে কত্তা, এনাটি আবার কে? সম্মুন্দী নাকি?"

ঈষৎ হাসিয়া দত্তজা বলিলেন, "হাঁ সম্বন্ধী, এ পক্ষের।"

আশ্চর্য্যান্বিতভাবে ভজহরি বলিল, "কও কথা কত্তা, তোমার আবার ক'টা পক্ষ আছে? আজ দশ বিশ বচ্ছর তো মা ঠাকরুণ মারা গেছে, বিয়ে করলে এতদিন পাঁচ সাতটা বিয়ে হতো। তা তুমি গা গোছ করলে কৈ?"

দত্তজা বলিলেন, "এবার গা গোছ ক'রেছি রে ভজা; পাঁচ সাতটা না হোক, দু'একটা করবো।"

ভজহরি হাঁ করিয়া দত্তজার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সহাস্যে দত্তজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর বিশ্বাস হচ্চে না?"

ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে ভজহরি উত্তর করিল, "একটুও না কত্তা, এটা তুমি নেহাৎ মস্করা কচ্চো।"

দত্তজা হাসিয়া উঠিলেন। ভজহরি অপ্রতিভ ভাবে বলিল,

"তাই তো বলি কত্তা, তুমি আবার বিয়ে করবে! তুমি কোথায় কাশী বিন্দাবন যাচ্চো।"

গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া দত্তজা বলিলেন, "হাঁ, কাশী যাব! তুইও যেমন ভজা, আমার বরাতে আবার কাশী আছে! এইখানেই ভাগাড়ে মাথা গড়াগড়ি যাবে।"

কর্ত্তার আক্ষেপ শ্রবণে ভজহরি ব্যথিত হইল; বিষণ্ণমুখে বলিল, "না কত্তা, তুমি আর দোতা মন কোরো না। যখন বলেছ, তখন চলে যাও। কিসের তরে আর এই গোভাগাড়ে পড়ে থাক্‌বে? এখানে তোমার আছে কে?"

দত্তজা হুঁকায় মুখ লাগাইয়া কিয়ৎক্ষণ গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলেন; তারপর জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বেদনাজড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "কেউ নাই রে ভজা, কেউ নাই। কিন্তু এমনি পাপ মন, এই শুকনো মাটীটাকেই যেন আঁকড়ে পড়ে থাকতে চায়। মনই পাপ রে ভজা, মনই পাপ।"

ভজহরি দেখিল, কর্ত্তার চোখ দুইটা চক্‌ চক্‌ করিতেছে। তাহার নিজের চোখেও জল আসিল; সেটাকে গোপন করিবার জন্য সে নাক মুখ সিটকাইয়া বলিয়া উঠিল, "তা বই কি কত্তা।"

দত্তজা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "আচ্ছা ভজা, তোর মনে পড়ে, আমি এইখানে ব'সে খাতা দেখতাম, মণে ছোঁড়া কাগজ কলম দিয়ে টানাটানি কত্তো, মেয়েটা হামাগুড়ি দিয়ে চার দিকে ঘুরতো। আমি ধমক দিলে

তুই আবার আমার উপর চোখ রাঙিয়ে তু'টোকে তু'কোলে নিয়ে—"

ভজহরি তুই হাতে মুখ ঢাকিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। দত্তজা তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "দূর হতভাগা, এইতেই তুই কেঁদে ফেললি, আর আমি যে সেগুলোকে নিজের হাতে পুড়িয়ে এসেছি রে। কিন্তু বল্ দেখি, এক দিনের তরেও আমাকে কাঁদতে দেখেছিস্?"

বলিয়া দত্তজা জোরে মাথাটা নাড়িয়া মৃদু হাসিলেন, সেই হাসির সঙ্গে তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও যে দুই ফোঁটা জল চোখের কোণ বহিয়া গড়াইয়া পড়িল, তাহাকে কিছুতেই রোধ করিতে পারিলেন না। সৌভাগ্যের বিষয়, ভজহরির দৃষ্টি তখন অশ্রুভারে ঝাপসা হইয়া আসিয়াছিল, সুতরাং সে এই অশ্রুবিন্দু লক্ষ্য করিতে পারিল না। নতুবা সে সঙ্গে সঙ্গেই কর্তার উক্তির অসত্যতা প্রতিপন্ন করিয়া দিত।

ভজহরি চোখ তুইটা মুছিয়া গাঢ়স্বরে বলিল, "তুমি যাই বল কত্তা, তোমার বুকখানা কিন্তু পাথর হ'য়ে গিয়েছে।"

সহাস্যে দত্তজা বলিলেন, "পাথর নয় রে ভজা, একেবারে লোহা, একটুও রস কস্ নাই, আছাড় মারলেও ভাঙবে না।"

একটু থামিয়া, একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দত্তজা পুনরায় বলিলেন, "সেই তরেই তো কাশী যেতে চাইচি। তীর্থের সার বারাণসী; দেখি, বিশ্বনাথের স্পর্শে লোহাটা যদি সোণা হয়।"

বলিয়া দত্তজা গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিলেন—

"এবার আমি যাব কাশী।
কাশীধামে যাব সদানন্দে রব,
আর কি আমি ফিরে আসি।"

হঠাৎ সঙ্গীত হইতে বিরত হইয়া ভজহরিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হাঁ, দেখ্ ভজা, আমি যে কাশী যাব, এটা কিন্তু কেউ বিশ্বাস করে না।"

ভজহরি গম্ভীরভাবে উত্তর করিল, "সে কথা ঠিক কত্তা। এই আমাকেই কত লোকে কত কি বলে।"

দত্তজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে কি বলে রে?"

ভজহরি বলিল, "কার আর নাম করবো কত্তা, তবে লোক-গুলো আমাকে যেন পেয়ে বসেছে। কেউ বলে, তোর মনিব কবে কাশী যাচ্চে রে ভজা? কেউ বলে কাশী যাবে, না মক্কা যাবে? ঘোষজা মশাই বলছিল—"

বাধা দিয়া দত্তজা বলিলেন, "কে, দেশো ঘোষ? সে আবার ঘোষজা মশাই হ'লো কবে? সে বেটা কি বলছিল রে?"

"বলে, হাঁরে ভজা, তোর মনিব কাশী গিয়ে নিরালায় বসে সুদের সুদ হিসেব করবে নাকি?"

ভ্রূকুটী করিয়া দত্তজা বলিলেন, "হাঁ করবে। সুদ আমি একাই খাই কি না, আর পাঁচ শা—যা খায় সেটা তো সুদ নয়। আচ্ছা ভজা, এই আমি বড় গলা ক'রে বলছি, তুই গলায় সাপ জড়িয়ে দোরে দোরে ঘুরে আয়, কেউ যদি বিনা সুদে তোকে একটা টাকা ধার দেয়—"

ভজহরি বলিয়া উঠিল, "এক টাকা! একটা পয়সার কথা কও কত্তা।"

মস্তক সঞ্চালন পূর্ব্বক দত্তজা বলিলেন, "তবেই বল, আমার কাছে তো কেউ টাকা জমা রাখে নি যে, বিনা সুদে ধার দিতে হবে। আর সুদ নিয়েই বা অসময়ে টাকা দেয় কে? ঐ যে দাশু ঘোষ আমার নিন্দে না ক'রে জল খায় না, ওর মায়ের শ্রাদ্ধের সময়, তোর মনে আছে তো, সেই ওর বোন ভৈরবীর ব্যাপার নিয়ে যখন পাঁচ জনে চেপে ধরলে, এক শো টাকা না দিলে কেউ ওর বাড়ীতে পাত পাড়বে না, তখন সেই রাত্রে এসে পা দু'টো জড়িয়ে ধরলে। লক্ষ্মীবার, অমাবস্যা, সে সব না মেনে সিন্দুক খুলে পুঁটী মাছের মত টাকাগুলো গুণে দিলাম। তার পর সেই টাকা আদায় দিতে আমাকে কি বেগটাই না দিয়েছে। তোর তো জানতে কিছু বাকী নাই, আদালতে দাঁড়িয়ে হলপ নিয়ে বললে টাকা ধারি না। আমার নেহাৎ হকের ধন, তাই কোন রকমে টাকাটা আদায় করেছি। অথচ আমি হ'লাম সুদখোর, কশাই, আর ওরা হ'লো পুণ্যবান্ ধার্ম্মিক। কি মজার সংসার ভজা?"

দত্তজার চোখে মুখে একটা ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। ভজহরি দোক্তা কুটিয়া তামাক মাখিতেছিল; মাখা তামাক ভাঁড়ে তুলিতে তুলিতে বলিল, "ভাল কথা কত্তা, তুমি নাকি ঐ ছেলেটাকে পুষ্যিপুত্তুর করবে?"

"কে বললে?"

"দোকানে কথা হচ্ছিল।"

ক্রুদ্ধভাবে দত্তজা বলিলেন, "কি কথা হচ্ছিল? কেন আমার কথা না হ'লে কি লোকে থাকতে পারে না? আমি কার কি করেছি বল্ তো?"

এ প্রশ্নের উত্তর ভজহরি দিতে পারিল না; সে নীরবে তামাকের ডেলা পাকাইতে লাগিল। দত্তজা ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "আমি পুষ্যিপুত্তুর নিই না নিই তাতে লোকের কি? আর পুষ্যিপুত্তুর নিতে হ'লে ওকেই বা নিতে যাব কেন?"

ভজহরি বলিল, "তা বৈকি কত্তা, দেশে কি আর ছেলে নাই? তবে ঐ যে ওনা এসে রয়েছে কি না, তাই লোকের সন্দ হয়।"

মুখ বিকৃত করিয়া দত্তজা বলিলেন, "লোকের সন্দ হয় আমি তার কি করবো বল্ তো? কেউ এসে দু'দিন থাকলেই বুঝি তাকে পুষ্যিপুত্তুর নিতে হয়? আর আপনার লোক থাকলে এমন কি আসে না? ও যে আমার আপনার লোক রে, ওকে জানিস্ না?"

জগতে দত্তজার আপনার বলিতে কেহ যে আছে ইহা কেবল ভজহরি কেন, দেশের কেহই জানিত না। কেন না দশ পনর বৎসরের মধ্যে দত্তজা আর ভজহরি ছাড়া বাহিরের কোন লোক এই বাড়ীতে পাত পাড়িয়াছে কিনা, বা দত্তজা নিজে দুই দিনের জন্য কোথাও পাতা পাড়িতে গিয়াছেন কিনা ইহা জানিতে হইলে অনেককে প্রবীণ লোকদের নিকট অনুসন্ধান লইতে

যাইতে হইত। সুতরাং দত্তজার আপনার লোকের কথায় ভজহরি চমৎকৃত হইয়া একটু আমতা আমতা করিয়া বলিল, "জানি বটে কত্তা, তবে কৈ কখন দেখেছি ব'লে মনে হয় না তো।"

তাহাকে তিরস্কার করিয়া দত্তজা বলিলেন, "দূর বেটা চাষা, ওকে তুই দেখবি কোথা হ'তে? তবে ওর মাকে তুই বেশ দেখেছিস্। রাজু রে, আমার ভাগ্নী রাজু। সেই যে বৎসর গিন্নী মারা যায়, গঙ্গা নাইতে গিয়ে আমার এখানে এসে হু'দিন রইলো না? সেই যে তুই বল্লি, আপনার ভাগ্নী কত্তা, একখানা দশীবাটা না দিলে ভাল দেখায় না। শেষে তুই নিজে মদনা গয়লার কাছ হ'তে সুদের চোদ্দ আনা আদায় ক'রে একখানা ন' হাতী কাপড় এনে দিলি, তাই নিয়ে দু'দিন আমি তোর কথা পর্য্যন্ত কইলাম না। নাঃ, তুই বেটা নেহাৎ বোকারাম, সঙ্গে তোর কিছু মনে থাকে না। এই সে দিনকার কথা ভুলে গেলি?"

ভজহরি সপ্রতিভভাবে বলিয়া উঠিল, "ভুলবো কেনে কত্তা, বেশ মনে আছে।"

"তোর মাথা আছে" বলিয়া দত্তজা হুঁকার মাথা হইতে কলিকা লইয়া ভজহরির দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, "তামাকটা পাল্‌টে সাজ্ দেখি।"

ভজহরি কলিকার ছাই ঢালিয়া তাহাতে তামাক ভরিতে ভরিতে বলিল, "তা কত্তা, তেনা তো তোমার ভাগ্নী।"

ধমক দিয়া দত্তজা বলিলেন, “ভাগ্নী নয় তো আমি কি বলছি বোন্‌পো। সেই রাজু, তারই ছেলে। ওকে এক বছরের রেখে রাজু মারা যায়। তারপর ওর বাবা আবার বিয়ে করে। দ্বিতীয় পক্ষ হ’লে তো প্রথম পক্ষের ছেলের আদর থাকে না। অমনি কোন রকমে ছেলেটা মানুষ হ’য়েছে, লেখাপড়া কিছু হয় নি। এ পক্ষের দু’তিনটি ছেলে রেখে বাপ মারা গিয়েছে। আর প্রথম পক্ষের মাণিকচন্দ্র আজ যাত্রার দল, কাল কবির লড়াই এই নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্চে। বারণ করবার তো কেউ নাই?”

ভজহরি বলিল, “কে আর বারণ করবে? কথাতেই আছে—মা মলে বাপ তালুই, ছেলে হয় বনের বাবুই।”

দত্তজা বলিলেন, “এতদিন যাত্রার দলেই ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তারপর অধিকারীর সঙ্গে ঝগড়া না মারামারি ক’রে এখানে এসেছে।”

কলিকায় ফুঁ দিয়া ধরাইয়া ভজহরি হস্ত সংযোগে তাহাতে একটা টান দিল; তারপর দত্তজার হাতে কলিকা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “উনি তা হ’লে এখন দিন কতক থাকবে?”

মুখ মচকাইয়া দত্তজা বলিলেন, “কে জানে ক’দিন থাকবে। আজ তিন দিন এসেছে, যাবার কথা তো কিছুই নাই। দেখি আর দু’চার দিন।”

ভজহরি বলিল, “আমার তো মনে হয় শীগ্‌গীর যাবে না।”

একটু উগ্রভাবে দত্তজা বলিলেন, “যাবে না তো অন্ন যোগাবে

কে? আমি কি এই রকম দু'বেলা রেঁধে ভাত দেব? খাওয়াটাও তো কম নয়; দেখেছিস্ তো আমাদের দু'জনের খোরাক একা খায়। হা-ঘরের ছেলে কি না।"

বলিয়া দত্তজা হুঁকায় একটা টান দিলেন, একবার কাশিয়া বলিলেন, "আর আমিই বা ক'দিন এখানে আছি? বড় জোর পনরোটা দিন। ওর ভাত রেঁধে দেবার তরে আমি কি এখানে ব'সে থাকবো?"

দত্তজা মুখ ফিরাইয়া লইয়া হুঁকায় ঘন ঘন টান দিতে লাগিলেন। ভজহরি তামাকের ভাঁড় তুলিয়া গাড় ধুইতে চলিয়া গেল।

খানিক পরে ভজহরি ফিরিয়া আসিলে দত্তজা তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, দেখ্ ভজা, কাল বাজার থেকে দু'পয়সার ভাল মাছ আনিস তো। ছোড়াটা আবার যা তা খেতে পারে না। আর খাবেই বা কি ক'রে? আমাদের তো খাওয়া নয়, কোন রকমে ছাই পাঁশ দিয়ে পেটটা ভরান। ওরা কি এসব খেতে পারে? দু'পয়সার ভাল মাছ আনাব, বুঝেছিস্?"

ভজহরি বলিল, "তা আনবো কত্তা। তবে দু'পয়সায় তো ভাল মাছ হবে না।"

রাগতভাবে দত্তজা বলিলেন, "দুপয়সায় হবে না তো কত পয়সার আনতে হবে? বড় জোর চার পয়সা। তা নয় তো দু'চার আনার মাছ কিনতে হবে নাকি? ওঃ ভারী তো আমার মাসীর মায়ের কুটুম।"

বলিয়া দত্তজা হুঁকাটা রাখিয়া যেন রাগে গর গর করিতে করিতে উঠিয়া পড়িলেন।

এমন সময় মাণিক আসিয়া ব্যস্তভাবে ডাকিল, "দাদা মশায় ?"

তাহার ব্যস্ততা দেখিয়া দত্তজা বিস্ময়ে থমকিয়া দাঁড়াইলেন।

৪

মাণিক বলিল, "শীগ্‌গীর একটা টাকা দাও তো দাদামশায়।"

যেন খুব একটা অসম্ভব কথা শুনিয়া দত্তজা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে মাণিকের মুখের দিকে চাহিলেন। মাণিক বলিল, "দেরী করলে চলবে না, শীগ্‌গীর দাও।"

দত্তজা বিস্ময়টাকে কথঞ্চিৎ দমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "টাকা নিয়ে কি হবে ?"

মাণিক উত্তর করিল, "গরবী গয়লানীকে দিতে হবে।"

"গরবী গয়লানীকে ? কেন ?"

মৃদু হাসিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে মাণিক বলিল, "সে গেরোর কথা কও কেন দাদামশায়, মাগী দুধের কেঁড়ে নিয়ে চলেছে, নিতে ছোঁড়ার সঙ্গে তর্ক হ'লো, এক ঢিলে কেঁড়েটা ভাঙ্গতে পারি কি না। নিতে বলে কিছুতেই পারবে না। হাঃ, সামনে ছিল এক আধলা ইট, দিলাম তাগ ক'রে ছুঁড়ে। মাণিক চন্দ্রের তাগ কি ফস্‌কায় ? কেঁড়ের গলাটা রইল মাগীর বগলে, আর দুধ সমেত তলাটা মাটীতে গড়াগড়ি।"

বলিয়া মাণিক হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার

এই দুষ্টামিতে ক্রোধের উদয় হইলেও দত্তজা না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। মাণিক হাসি থামাইয়া বলিল, "তা বলবো কি দাদামশায়, মাগী কি গালটাই দিলে, মুখ দিয়ে যেন খই ফুটতে লাগলো। নিতে ছোঁড়া দিলে চম্পট, মাগী পড়লো আমার উপর। আমার এমন ইচ্ছা হ'লো, দিই মাগীকে দু'ঘা বসিয়ে। দিতামও তাই, কিন্তু হঠাৎ ঐ মেয়েটা এসে পড়লো। ঐ যে মেয়েটা সে দিন বসেছিল, যাদের বাড়ীতে খেয়ে এলাম, কি নামটা ?"

দত্তজা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "কৈলাসী বুঝি ?"

মাণিক বলিল, "হাঁ হাঁ কৈলাসীই বটে। তা মেয়েটা এসে এমন শালিসী আরম্ভ করলে যে, আমাকে একেবারে থ' বানিয়ে দিলে। কাজেই দুধের দাম এক টাকা দেব স্বীকার ক'রে এসেছি।"

শেষ বেলার সোণালি আলোর উপর কালো মেঘের ছায়ার মত দত্তজার হাস্যপ্রফুল্ল মুখখানা হঠাৎ যেন অন্ধকার হইয়া আসিল। তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "খুব কাজই করেছ। কিন্তু এক টাকায় কত আনা বল দেখি ?"

"ষোল আনা।"

"ষোল আনায় কত পয়সা ?"

মাণিক হাসিয়া উঠিল, বলিল, "তা বুঝি আমি জানি না, চৌষট্টী পয়সা।"

দত্তজা গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক বলিলেন, "বেশ, এই চৌষট্টি পয়সা কত কষ্টে আসে তা জান ? ধর, একজনকে

একটা টাকা ধার দিলাম। এক টাকার সুদ মাসে দু' পয়সা। তা হ'লে বছরে ছ' আনা; দুবছরে বার আনা, আর আট মাসে হ'লো চার আনা। তবেই দেখ, এক টাকায় একটী টাকা আসতে দু'বছর আট মাস লাগে।"

হাঁ করিয়া দত্তজার মুখের দিকে চাহিয়া মাণিক এই দীর্ঘ হিসাব শুনিতে লাগিল। হিসাব বুঝাইয়া দিয়া দত্তজা ধীরে ধীরে বলিলেন, "সেই একটা টাকা এক কথায় খরচ করা তুমি যতটা সহজ মনে কর মাণিকচন্দ্র, বাস্তবিক ততটা সহজ নয়।"

কেন যে সহজ নয় তাহা না বুঝিলেও মাণিক ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "তা তো নয়, কিন্তু আমি যে স্বীকার করে এসেছি।"

দত্তজা বলিলেন, "এমন অন্যায় স্বীকার ক'রে ভাল কাজ কর নি। যদি দুধের দামই দিতে হয়, তা হ'লে দেখতে হবে কত দুধ ছিল। কেঁড়েটা কত বড়?"

হস্ত দ্বারা কেঁড়ের আয়তন বুঝাইয়া দিয়া মাণিক বলিল, "এত বড়।"

দত্তজা বলিলেন, "বেশ, ঐ রকম একটা কেঁড়েতে বড জোর চার সের দুধ থাকতে পারে। কিন্তু কেঁড়ে যে ভরা ছিল তার ঠিক কি? আচ্ছা ধরে নিলাম, তিন সের দুধ ছিল। তা হ'লে তিন সের দুধের দাম তিন আনা, যদি খাঁটিই হয় তবে জোর আঠার পয়সা, আর কেঁড়েটার দাম দু'পয়সা; এই তো পাঁচ আনা তার পাওনা।"

মাণিক ম্লান মুখে নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। একটু ভাবিয়া দত্তজা বলিলেন, "গেল বছরে গরবী পায়ে হাতে ধরে সুদের তিনগণ্ডা পয়সা ছাড়িয়েছিল। তা সে যদি দু'সের দুধের মায়া ত্যাগ কত্তে না পারে, তবে আমিই বা কেন তিন গণ্ডা পয়সা ছেড়ে দেব? তা হ'লে পাঁচ আনার তিন আনা গেল, থাকে দু'আনা। আচ্ছা, দু'গণ্ডা পয়সা ফেলে দিলেই হবে। সে জন্য তোমার ভাবনা নাই।"

মাণিক হতবুদ্ধির ন্যায় চুপ করিয়া রহিল। সে কৈলাসীর সমক্ষে জোর গলায় বলিয়া আসিয়াছিল, এখনই একটা টাকা আনিয়া গরবীর দুধের দাম ফেলিয়া দিবে। বড় লোকের দস্তুরই এই। তাহাদের গ্রামের জমিদার এক প্রজার ভাঙ্গা ঘর জ্বালাইয়া দিয়া নূতন ঘর গড়িয়া দিয়াছিলেন। একবার হরি জেলেকে বেত মারিয়া পাঁচ টাকা বকশিষ করিয়াছিলেন। সুতরাং সে গোয়ালিনীর দুই সের দুধ নষ্ট করিয়া যে দশ সের দুধের দাম আনিয়া দিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি আছে।

কিন্তু দাদা মশায় যে এক টাকার স্থলে নগদ দুই আনা দিয়া তাহার বড়মানুষী চাল ব্যর্থ করিয়া দিবেন তাহা সে জানিত না। এক্ষণে দাদা মশায়ের সোজা হিসাব শুনিয়া সে চমৎকৃত-ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দাদামশায় তাহার ম্লান মুখশ্রী লক্ষ্য করিয়া আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "আচ্ছা আচ্ছা, আমি নিজে গিয়ে কাল বুঝিয়ে দিয়ে আসবো। তোমাকে যেতে হবে না, বুঝলে?"

মাণিক কিন্তু বুঝিল না; সে কিছুক্ষণ গম্ভীর ভাবে থাকিয়া ভারী মুখে বলিয়া উঠিল, "তা হ'লে টাকাটা দেবে না ?"

দত্তজা হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসতে বলিলেন, "এই দেখ পাগল। একটা কেন, তোকে এখনি দশটা টাকা দিতে পারি। কিন্তু মনে ক'রে দেখ—"

সরোষে মাণিক বলিল, "মনে করে দেখেছি দাদামশায়, টাকা তুমি কিছুতেই খরচ কত্তে পার না।"

এই সত্য উক্তিতে দত্তজা যেন অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়া হাসিতে লাগিলেন। মাণিক মুখখানা বিকৃত করিয়া তাঁহার সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল।

ভজহরি আসিয়া বলিল, "হ্যাদে কত্তা, মাণিকবাবু মুখখানাকে হাঁড়ী ক'রে চলে গেল যে ?"

গম্ভীরভাবে দত্তজা মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "বাবু রাগ ক'রে গেল রে ভজা, রাগ করে গেল।"

ভজহরি জিজ্ঞাসা করিল, "রাগটা কিসের কত্তা ?"

দত্তজা বলিলেন, "টাকা রে ভজা, টাকা। বাবু এসেছিলেন টাকা চাইতে।"

আশ্চর্য্যের সহিত ভজহরি বলিয়া উঠিল, "টাকা !"

দত্তজা বলিলেন, "হাঁ হাঁ, বুড়োর মাথায় কাঠাল ভেঙ্গে বাবু বড় মানুষী চাল দেখাবেন। ব'সে ব'সে অন্নধ্বংস কচ্চেন, তার উপর টাকা দাও, পয়সা দাও।"

ভজহরি গম্ভীরভাবে বলিল, "বলতে কি কত্তা, ছোকরার একটু সমীহ নাই, যেন কত বড় ফুল বাবু। ওরে ভজা জল নিয়ে আয়, পা টিপে দে ভজা। ভজা যেন ওনার সাত পুরুষের চাকর। কি বলবো কত্তা, তোমার আপনার লোক!"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দত্তজা বলিলেন, "ওঃ, ভারী আপনার লোক: বলে—ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ গেল শল্য হলো রথী। নিজের পরিবার সব কোথায় চলে গেল, আর ভাগ্নার ছেলে মানিক হ'লো আপনার লোক। ঝাঁটা মার, সব খাবার কুটুম।"

ভজহরি জিজ্ঞাসা করিল, "কদ্দিন থাবে?"

বিরক্তি সহকারে দত্তজা উত্তর করিলেন, "ভগবান্ জানেন; আর যাবেই বা কোথায়? যাবার ঠাঁই থাকলে কি সুবাদ খুঁজিয়ে বুড়োর ঘাড়ে এসে পড়ে।"

ভজহরি বলিল, "তা বৈকি কত্তা, নিজেদেরই কে একমুঠো তৈরী ক'রে দেয় তার ঠিক নাই। তার উপর আবার এই উপসগ্‌গ।"

গম্ভীর ভাবে দত্তজা বলিলেন, "বিষম উপসর্গ। তবে কি জানিস্ ভজা, মানুষ হ'লো পাখীর জাত, যেখানে একটা পাখী থাকে, সেইখানেই আর একটা পাখী এসে বসে। তা এসেছে থাক, আমিও তো এই ক'টা দিন আছি। তারপর যেখানে খুসী যাবে তখন। যখন এসে পড়েছে, তখন যাও বলতে পারা যায় না তো; আর সেটা বলাও উচিত নয়। আছে, থাক, বোঝার উপর শাকের আঁটি বৈ তো নয়।"

ভজহরি ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "কিন্তু লোকে কি বলে জান কত্তা, ও তোমার শাকের আঁটি নয়, সুদের সুদ।"

দত্তজা হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "লোকে এক একটা কথা মন্দ বলে নি ভজা, সুদের সুদই বটে। ধর্ ভগ্নী হ'লো যেন আসল, তার মেয়ে হ'লো সুদ, তা হ'লেই ভাগ্নীর ছেলে হচ্চে সুদের সুদ। আমি সুদের সুদ খাই কি না, তাই সুদ আসল সব নিয়ে সুদের সুদ এসে ঘাড়ে চেপে বসেছে। এ এক রকম মন্দ নয় রে ভজা।"

বলিয়া দত্তজা হাসিতে লাগিলেন। ভজহরি তামাক এক-ছিলিম সাজিয়া লইয়া বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল। দত্তজা তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "কোথায় যাস্?"

ভজহরি উত্তর দিল, "গরুটাকে খাবার দিয়ে আসি।"

দত্তজা বলিলেন, "এই তো সন্ধ্যে বেলা, এরি মধ্যে গরুকে খাবার দেওয়া কেন? কোথাও যেতে হবে বুঝি?"

ভজহরি ডান হাতে হুঁকা ধরিয়া বাঁ হাতে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে একটু ভারী সুরে বলিল, "যাব আর কোথায় কত্তা, তোমার ঘরে থেকে এক পা কোথাও যাবার যো আছে কি? তবে ছিদেম বাগ একবার ডেকেছে—"

সহাস্যে দত্তজা বলিলেন, "কেন রে, তার মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে দেবে নাকি?"

সদুঃখে ভজহরি বলিল, "আর বিয়ে কত্তা, বিয়ে হবে একেবারে কাঠে খড়ে।"

দত্তজা বলিলেন, "সে তো হবেই রে বোকা, তোরও হবে, আমারও হবে। তার আগে—মাইরি ভজা, তুই একটা বিয়ে কর্, যত টাকা লাগে আমি দেব।"

ভজ। দেবে, আবার নেবে তো?

দত্ত। তা নয় তো তুমি এমন কি কুলীনের সন্তান যে, তোমাকে আমি দানছত্র করবো। তবে সুদ নেব না তা বলছি।

বলিয়া দত্তজা ভজহরির মুখের দিকে সহাস্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ভজহরি ভারী মুখে ঈষৎ রুক্ষস্বরে বলিল, "সুদ আর কোন্ মুখে নেবে কর্তা। বিশ বচ্ছর চাকরী কচ্চি, কখনো বললে না, একটা পয়সা নে রে ভজা, জলপান কিনে খাবি। অপরের কাছে কাজ করলে—"

"এদ্দিন কোঠা বালাখানা ক'রে ফেলতিস্, না?"

বলিয়া দত্তজা হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। ভজহরি মুখখানাকে ভারী করিয়া প্রস্থানোদ্যত হইল। দত্তজা বলিলেন, "আচ্ছা আচ্ছা, না হয় দান করাই যাবে রে। এখন এক কাজ কর্ দেখি, সুদের সুদটা কোথায় গেল একবার দেখ্ তো।

মুখ মচকাইয়া ভজহরি বলিল, "যাবে আর কোথায়?"

দত্তজা বলিলেন, "যাবে না তা জানি; যাবার জায়গা থাকলে কেউ সহজে গোবিন্দ দত্তর কাছে আসে না। তবু, ঐ দিকেই যাবি তো, একবার দেখিস্ না। ছোকরা মুখটা ভার ক'রে চলে গেল। চুলোয় যাক্, না না, তুই আপনার কাজে যা। আমিও যেমন, ছেঁড়া সুতোয় গেরো দিচ্চি। দীননাথ, পার কর প্রভু।"

ভজহরি চলিয়া গেল। দত্তজা পা হাত ধুইয়া হরিনামের মালা লইয়া বসিলেন।

তখন সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকারে গৃহ প্রাঙ্গণ সব আচ্ছন্ন হইয়াছে; অন্ধকার আকাশতলে দুই চারিটা তারকা বিক্ষিপ্ত ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে; বাতাসে নারিকেল গাছের পাতাগুলা সরসর শব্দ করিতেছে। বাড়ীখানা স্তব্ধ। দত্তজা পিছনে ফিরিয়া চাহিলেন; ঘরের ভিতর শুধু জমাট অন্ধকারে; খোলা জানালা দিয়া বাতাসটা ঠিক মৃদু দীর্ঘশ্বাসের মত ঘরের ভিতর ছুটিয়া বেড়াইতেছে। দত্তজা মুখ ফিরাইয়া লইয়া তাড়াতাড়ি পড়িতে লাগিলেন,—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।"

জপ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় কৈলাসীর বাপ রমানাথ সরকার আসিয়া ডাকিল, "খুড়ো আছ নাকি?"

"এসো বাবাজী" বলিয়া দত্তজা আসনটা বাঁ হাত দিয়া সরাইয়া দিলেন। এতক্ষণ স্তব্ধ অন্ধকারে তাঁহার নিশ্বাসটা যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, এক্ষণে আরামের নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া একটু চাপিয়া বসিলেন।

৫

রমানাথ বলিল, "কৈলাসীর বিয়ের কি করি বল দেখি খুড়ো ?"

দত্তজা বলিলেন, "আমি তো গোড়াতেই বলেছিলাম বাবাজি, আমার হাতে দাও। কিন্তু তখন বুড়ো জামাই পছন্দ হ'লো না, এখন টাকা দিয়ে ছোকরা জামাই নিয়ে এস।"

বলিয়া দত্তজা মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। রমানাথ ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "কৈলাসীর এমন কি ভাগ্য খুড়ো, তুমি তাকে গ্রহণ করবে।"

মস্তক সঞ্চালন পূর্ব্বক গম্ভীরস্বরে দত্তজা বলিলেন, "তা বাবাজি, তোমরা যতটা মনে কর, আমাকে দিলে কৈলাসীর ততটা দুর্ভাগ্য সত্যিই হ'তো না। যাক্, গতস্য শোচনা নাস্তি। কিন্তু এই ব'লে রাখছি বাবাজি, কোন শা—ছোঁড়া বুড়োদের মত স্ত্রীকে আদর কত্তে পারবে না।"

বলিয়া তিনি হাসিয়া উঠিলেন। রমানাথ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "কাল একটী পাত্র দেখে এলাম, থার্ড ক্লাস পর্য্যন্ত পড়া। রেলওয়ে আপিসে বেরুচ্চে, এখনো মাইনে হয় নি। মা আছে বাপ নাই, তিন ভাই, এইটী বড়। জমিজায়গা তেমন কিছু নাই। শ'চারেক টাকা হ'লে হয়।"

গম্ভীরভাবে দত্তজা বলিলেন, "বেশ তো।"

রমানাথ বলিল, "হাঁ, এখন টাকাটার যোগাড় কত্তে পারলেই হয়।"

দত্তজা নিরুত্তরে বসিয়া রহিলেন। রমানাথ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "তোমার কাশী যাওয়াই কি ঠিক হলো খুড়ো ?"

দত্তজা বলিলেন, "এক রকম ঠিক হয়েই আছে বৈকি। এখন আদায় উশুলগুলো হ'লেই হয়। পাওনা গণ্ডা ফেলে তো যেতে পারি না। আর দু'পাঁচ টাকা নয় যে, দূর হোক যাক্। প্রায় হাজার দেড়েক হবে। এই ধর না তোমার কাছেই তো দেড় শো।"

রমানাথ নতমুখে বসিয়া মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে লাগিল। দত্তজা মালাছড়া যথাস্থানে তুলিয়া রাখিয়া ভাল হইয়া বসিলেন। রমানাথ বলিল, "তুমি যাবে বটে খুড়ো, কিন্তু তুমি চলে গেলে আমাদের বড়ই কষ্ট হবে। দু'পয়সা পেতেই বল, কি ভাল মন্দ যুক্তি পরামর্শ চাইতেই বল, আর কে আছে ?"

ঈষৎ হাসিয়া দত্তজা বলিলেন, "তা বটে বাবাজি, কিন্তু আমারো তো থাকলে আর চলে না। আর আজ না হয় কাশী যাচ্ছি, কিন্তু যে দিন ঠিকানায় যেতে হবে সে দিন তো রাখতে পারবে না। আর সেদিনেরও বেশী দেরী নাই।"

দত্তজা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। রমানাথ কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া চিন্তামলিনস্বরে বলিল, "তা হ'লে মেয়েটার কি করি বল তো খুড়ো।"

একটু ভাবিয়া দত্তজা বলিলেন, "আমার কথা শুনবে বাবাজি ?"

"শুনবো বৈ কি খুড়ো।"

"তা হ'লে এক কাজ কর, এত সুপাত্র-কুপাত্র বিচারে কাজ নাই একটা যেমন তেমন ছেলে দেখে মেয়ে দিয়ে দাও, এক পয়সা খরচ হবে না। তারপর মেয়ের অদৃষ্টে থাকে সুখ হবে।"

রমানাথ বলিল, "সে কথা ঠিক খুড়ো, সুখ দুঃখ সবই কপালে করে। তবে বাড়ীর সকলের ম য় না এই তো বিপদ্।"

দত্তজা বলিলেন, "বৌমার কথা বলছো তো ? ওঁদের কোন কালেই মত হবে না। দেখ বাবাজি, লোকে বলে—মেয়ে মানুষ লক্ষ্মী। কিন্তু ওঁদের মধ্যে লক্ষ্মীশ্রী তো কিছুই দেখতে পাই না, এক একটী মেয়ে মানুষ এক একটা অলক্ষ্মীর অবতার। পয়সাগুলো খরচ করিয়ে কি রকমে দুনিয়ার ফকির হ'তে হয়, সে বুদ্ধি ওঁরা বেশ দিতে পারেন। এই দেখ না, তোমার খুড়ী যতদিন বেঁচেছিল, এক পয়সা জমাতে পেরেছি ? যত্র আয় তত্র ব্যয়। তার পর আজ পনরো বচ্ছর তিনি মারা গেছেন, এই পনরো বচ্ছরে ধর তোমাদের কল্যাণে যেমন হোক দু'পয়সা তো হাতে জমেছে।"

বলিয়া দত্তজা গর্ব্বভরে একবার মস্তক সঞ্চালন করিলেন। স্ত্রীলোক যে অলক্ষ্মীর অবতার এই নূতন কথাটা ধারণা করিতে না পারিয়া রমানাথ হতবুদ্ধির ন্যায় তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া

রহিল। তাহার এই বিস্ময়ভাব লক্ষ্য করিয়া দত্তজা ধীর গম্ভীর-স্বরে বলিলেন, "তুমিই বুঝে দেখ না বাবাজি, তোমার এমন কি আয়, যাতে তুমি চার পাঁচ শো টাকা দেনা কত্তে পার? আজ দু'বছরের উপর এক শো টাকা নিয়েছ, তাই সুদে আসলে দেড় শো দাঁড়িয়েছে, তবু মাঝে মাঝে কতক সুদ ফেলে দিয়েছ। এর উপর বৌমার বুদ্ধি শুনে যদি আবার এতগুলো টাকা দেনা কর, তা হ'লে তোমার অবস্থাটা কি হবে ভেবে দেখ দেখি। তোমার তো মাসে আয় তিরিশটী টাকা, কিন্তু পাঁচ শো টাকার সুদই হচ্চে পনরো টাকা দশ আনা। তখন টাকার সুদ দেবে, না পেটে খাবে? বৌমা কি তখন উপোস ক'রে থাকবেন?"

এ প্রশ্নের উত্তর রমানাথ দিতে পারিল না, সে চিন্তিতভাবে নতমুখে বসিয়া রহিল। দত্তজা বলিলেন, "আমার কথা যদি শোনো, তা হ'লে একটা মুখ্যু সুখ্যু গরীবের ছেলে বা তেমন যদি পাও, দ্বিতীয় পক্ষ কি তৃতীয় পক্ষ দেখে পার ক'রে দাও।"

বিমর্ষ মুখে রমানাথ বলিল, "তাই করাই আমার পক্ষে উচিত খুড়ো, তবে পাঁচজনে বলবে—"

তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া দত্তজা বলিলেন, "বলবে রমা সরকার মেয়েটাকে জলে ফেলে দিলে। এই লোকনিন্দার ভয়ে অবস্থার অতিরিক্ত কাজ ক'রে কত লোক যে উচ্ছন্নে যায় রমানাথ, তার সীমা নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, নিন্দা তো অনেকেই কত্তে পারে, এক পয়সা দিয়ে সাহায্য কত্তে কেউ আছে?"

ঘাড় নাড়িয়া রমানাথ বলিল, "কেউ করবে না খুড়ো।"

দত্তজা বলিলেন, "তবেই বল বাবাজি, লোকের নিন্দা সুখ্যাতিতে কি আসে যায়। এই যে কত লোক আমাকে সুদখোর কশাই ব'লে আড়ালে গালাগালি দেয়। কিন্তু দরকার পড়লে সেই বেটারাই আবার মশায় মশায় ক'রে আমার কাছে এসে হাত পাতে। কেমন, একথা ঠিক কি না?"

বলিয়া তিনি রমানাথের মুখের দিকে সহাস্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার কথাটা যে ঠিক ইহা রমানাথ অস্বীকার করিতে পারিল না। কেন না যাহারা দত্তজাকে কশাই আখ্যায় অভিহিত করে তাহাদের মধ্যে রমানাথও একজন। সুতরাং দত্তজার শ্লেষোক্তিতে রমানাথ লজ্জায় মস্তক নত করিল।

এমন সময় ভজহরি আসিয়া বলিল, "তোমার সুদের সুদের নাগাল পেলাম না কত্তা।"

ভ্রূকুটী করিয়া দত্তজা বলিলেন, "মর্ বেটা, তুই নাগাল পেলি না আমি তার কি করবো বল্ তো? আমি এই রাত্রে দোর দোর ঘুরে তাকে খুঁজতে যাব নাকি?"

গম্ভীরমুখে ভজহরি বলিল, "খুঁজতে হয় খোঁজ গে কত্তা, আমি তো চললাম।"

ক্রুদ্ধভাবে দত্তজা বলিলেন, "চুলোয় যা সব। তোরা যাবি কি থাকবি সেই ভাবনায় তো আমি অস্থির। সব আমার গুরুপুত্র কি না।"

বলিয়া দত্তজা রমানাথকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বুঝেছ

বাবাজি, আমাকে সব এমনি পাগল মনে করেছে যে, ঐ ভজা বেটা পর্য্যন্ত যাই যাই ক'র আমাকে ভয় দেখায়। আরে হতভাগা, যাওয়াকে কি আমি ভয় করি? তা হ'লে যে সব চলে গিয়েছে তাদের তরে ভেবে ভেবে এত দিন আমাকে সত্যিকার পাগল হ'তে হ'তো যে। কিন্তু কার তরে ভাববো, সংসারে কে কার।"

খুব উত্তেজিতভাবে কথাগুলা বলিলেও দত্তজার কণ্ঠস্বরটা ভারী হইয়া আসিল। সেটাকে গোপন করিবার জন্য তিনি খুব জোরে একবার কাশিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভজা বেটার আক্কেল শুনেছ, আমি যাব মাণকে ছোঁড়াকে খুঁজতে।"

রমানাথ জিজ্ঞাসা করিল, "মাণিক রাগ ক'রে গিয়েছে নাকি?"

মুখ মচকাইয়া দত্তজা বলিলেন, "হাঁ হাঁ, রাগ করলেই তো হ'লো। সংসারে যাঁর মন যোগাতে না পারবে তাঁরই রাগ। থাম না, এই কটা দিন বাদে সবার মন যোগাচ্চ। আর নেড়া বেল তলায় যায়! উঃ, এই পঞ্চাশ বচ্ছর যদি সেই একজনের মন যুগিয়ে থাকতাম তা হ'লে আজ কি পরকালের তরে ভাবতে হয়। দীনবন্ধু হে, তোমারই ইচ্ছা।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দত্তজা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং চাদরখানা কাঁধে ফেলিয়া বলিলেন, "গোপাল মোড়ল সন্ধ্যার পর টাকা দেবে বলেছিল, একবার দেখি।"

রমানাথও তাঁহার সহিত বাহিরে আসিল। পথে আসিয়া

রমানাথ জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা খুড়ো, এক কাজ করলে হয় না ?"

"কি কাজ ?"

"মাণিকের হাতে কৈলাসীকে দিলে মন্দ হয় কি ?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দত্তজা বলিলেন, "তার চাইতেও ভাল হয় রমানাথ, যদি মেয়েটার গলায় কলসী বেঁধে রায়দীঘির জলে ফেলে দিতে পার।"

বলিয়াই তিনি রমানাথের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া পাশের পথ ধরিলেন।

কিয়দ্দূর যাইতেই দত্তজা শুনিতে পাইলেন, সম্মুখে ঘোষেদের বৈঠকখানায় বসিয়া হার্মোনিয়মের সুরে গলা মিশাইয়া কে গাহিতেছে—

"মন হারালি কাজের গোড়া।
তুমি দিবানিশি ভাব বসি কোথায় পাব টাকার তোড়া।"

দত্তজা দাঁড়াইয়া পড়িলেন ; উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলেন—

"টাকি কেবল ফাঁকি রে মন,
শ্যামা মা মোর হেমের ঘড়া ;
তুই কাচ মূলে কাঞ্চন বিকালি
এমনি রে তোর কপাল পোড়া।
মন হারালি কাজের গোড়া।"

আহা, কি সুন্দর গান ! কি সুমিষ্ট সুর ! গানের প্রতি কথায় কি সুন্দর উপদেশ ! সত্যই তো, টাকা টাকা করিয়া মন

নিজের কাজ হারাইতে বসিয়াছে। চাকি তো বাস্তবিক ফাঁকি। নতুবা সিন্দুকভরা চাকি থাকিতে আজ তাঁহাকে সব ফেলিয়া আসলের অন্বেষণে দেশান্তরে ছুটিতে হইবে কেন? ওহো, সব ফাঁকি, সব ফাঁকি। স্ত্রীপুত্র পরিজন ফাঁকি, টাকা পয়সা ফাঁকি, সংসারটাই একটা মস্ত ফাঁকি। অথচ এই ফাঁকি লইয়া মন এতদিন এমনই আত্মহারা হইয়াছিল যে, আসল জিনিষটাকে একবারও ভাবিয়া দেখিবার অবসর পায় নাই। এখনিই কি ভাবিতে চায়? এখনও যে সে উচ্ছৃঙ্খল ঘোড়াটার মত বিষয়-বাসনারূপ কাঁটা বনের দিকেই ছুটিতে থাকে। মা, মা, এই অবাধ্য মন-ঘোড়াকে সংযত করিয়া দাও।

ক্ষোভে দুঃখে দত্তজার বুকটা ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। গায়ক তখন গাহিতেছে—

"প্রসাদ বলে ভাবচো কি মন,
তুমি পাঁচ সওয়ারের তুর্কি ঘোড়া,
সেই পাঁচের আছে পাঁচাপাঁচি
তোমায় করবে তোলাপাড়া।"

কার গলা? মাণিকের না? মানকে ছোঁড়া এমন সুন্দর গায়? ঐ হতভাগা ছোঁড়ার পেটে এত গুণ তা কে জানে। বসিয়া উহার দুইটা গান শুনিলে হয়। কিন্তু ঐ ছোঁড়াদের আড্ডায় যাওয়া কি ভাল দেখায়? বিশেষতঃ মাণিক যদি মনে করে, দাদামশায় তাহারই অন্বেষণে আসিয়াছে? দত্তজা চমকিত ভাবে পার্শ্বে পশ্চাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; তিনি

এখানে দাঁড়াইয়া আছেন, কেহ দেখিতে পাই নাই তো? না, অন্ধকারে কে দেখিতে পাইবে? কিন্তু বৈঠকখানা হইতে যদি কেহ বাহিরে আসে? দত্তজা আর একবার চারিপাশে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দ্রুতপদে গৃহাভিমুখী হইলেন। তাঁহার আর তাগাদায় যাওয়া হইল না।

৬

"আচ্ছা দাদামশায়?

"কেন গা দিদিমণি?"

"বুড়ো বয়সে তোমার রঙ্গ্ এত কেন বল তো?"

দত্তজা হাসিয়া বলিলেন, "রঙ্গ্ বুড়ো বয়সে হয় না তো ছোকরা বয়সে হয় কি দিদি? দেখিস্ না, ছোঁড়াদের বিয়ে কত্তে বললে ষাঁড়ের মত মাথা নাড়ে, আর বুড়োরা দাঁত বাঁধিয়ে, পাকা চুলে কলপ দিয়ে বিয়ে কত্তে যায়।"

ঈষৎ হাসিয়া কৈলাসী বলিল, "তোমাকে চুলে কলপ দিতে হ'লেও দাঁত বাঁধাবার খরচ লাগবে না। কিন্তু কৈ, কলপ দেওয়া চুলে টোপর পরলে না তো?"

গম্ভীরভাবে দত্তজা বলিলেন, "পরতাম কি না দেখতে পেতিস্। কিন্তু রমা ছোঁড়া কি মানুষ! হতভাগা আমার কথা শুনলে কোথায়? এমন বুদ্ধি, মানুকের মত ছোঁড়ার হাতে দেবে, তবু আমাকে পছন্দ হবে না।"

কৈলাসী তাঁহার মুখের উপর সহাস্য কটাক্ষ নিক্ষেপ

করিয়া বলিল, "তাই বুঝি মনের খেদে আজকাল গান বাজনার সখ্ হ'য়েছে ?"

হাস্যগম্ভীর স্বরে দত্তজা বলিলেন, "একটা সখ্ চাই তো। আর এমন মন্দ সখই কি। মানকে বলে 'ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরং' অর্থাৎ—"

বাধা দিয়া রোষগম্ভীর কণ্ঠে কৈলাসী বলিল, "অর্থাৎ দিন নাই রাত নাই, ষাঁড় চেঁচিয়ে পাড়া শুদ্ধ লোককে ঝালাপালা কর্ত্তে হয়।"

ধীরভাবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া দত্তজা বলিলেন, "অমন কথা বলিস না কৈলাসী, মানকের মত মিষ্ট গলা এ গাঁয়ে কারো নাই। যখন হার্ম্মোনিয়মের সঙ্গে গলা মিশিয়ে গায়—"

"তখন মনে হয়, ঝিঁ ঝিঁ পোকার সঙ্গে গলা মিশিয়ে গাধা ডাকছে।"

"তোর চমৎকার সুর-বোধ কৈলাসী। ও ছোঁড়া যেমন পাকা গায়ক, তুই তেমনি সমজদার শ্রোতা। দু'জনে মিলবে ভাল।"

বলিয়া দত্তজা হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন। কৃত্রিম রোষে মুখখানা গম্ভীর করিয়া কৈলাসী বলিল, "আচ্ছা দাদা মশায়, এ দিকে তো তোমার হাত দিয়ে জল গলে না, কিন্তু এতগুলো টাকা খরচ ক'রে ওকে হার্ম্মোনিয়ম কিনে দিলে।"

দত্তজা বলিলেন, "সহজে কি দিয়েছি, ছোঁড়া যে আহার নিদ্রা ত্যাগ করলে। আর ভেবে দেখলাম, ঐ যে পাড়ায় পাড়ায়

আড্ডা দিয়ে বেড়ায়, কে জানে কোন্ দিন গাঁজা ধরবে, গুলি ধরবে, মদ খাবে। তার চাইতে পঁচিশটে টাকা দিলে যদি ঘরবাসী হয়, হোক্।"

"ও ঘরবাসী হ'লে তোমার কি দাদামশায়?"

"আমার? আমার আর কি দিদি। তবে একটু আছে ও বৈকি। দেখ্ কৈলাসী, সারাদিনটা ঝড় ঝাপটাতেই কেটে গেল, এখন সন্ধ্যার সময় যদি একটু চিক্‌চিকে রোদ দেখতে পাই, তবু আরামের নিশ্বাস ফেলে যেতে পারবো।"

বলিয়া দত্তজা আপনার সজল দৃষ্টি কৈলাসীর মুখের উপর স্থাপন করিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বরে যে কাতরতা ফুটিয়া উঠিল, তাহাতে কৈলাসীর প্রাণটা যেন আর্দ্র হইয়া আসিল; সুতরাং দত্তজার সজল দৃষ্টির সম্মুখে সে আপনাকে স্থির রাখিতে না পারিয়া মস্তক নত করিল। ঈষৎ গাঢ়স্বরে দত্তজা বলিলেন, "আসল কথা কি জানিস্ কৈলাসী, এই পঞ্চাশ বছরে রাগ তাপ, গাল মন্দ অনেক পেয়েছি, কিন্তু স্নেহের আবদার কখন পাই নি। এই যে গায়ের রক্তের মত পঁচিশটে টাকা এক নিশ্বাসে ফেলে দিয়েছি, এ সেই আবদারের দাম। বুঝেছিস্?"

সবটা না বুঝিলেও কৈলাসী যতটা বুঝিল, তাহাতেই ঘাড় নাড়িয়া ইহার উত্তর দিল।

রান্না ঘরে বসিয়া কথাবার্ত্তা হইতেছিল। উনানে ভাত ফুটিতেছিল; দত্তজা পায়ে বঁটি চাপিয়া তরকারী কুটিতেছিলেন। তরকারী কুটিতে কুটিতে কৈলাসীর সহিত গল্পে এমনই তন্ময়

হইয়াছিলেন যে, ফুটন্ত ভাতের দিকে তাঁহার আদৌ লক্ষ্য ছিল না। সহসা ভাতের ধরা গন্ধে তিনি চমকিত হইয়া উঠিলেন। কৈলাসী বলিল, "তোমার ভাত ধ'রে গেছে যে দাদামশায়।"

দত্তজা তাড়াতাড়ি উঠিয়া হাঁড়ীতে জল ঢালিয়া দিলেন এবং মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, "এঃ, একেবারে পুড়ে গিয়েছে।"

বলিয়া তিনি হাঁড়ী হইতে ভাত তুলিয়া টিপিতে লাগিলেন। কৈলাসী বঁটি চাপিয়া বসিল, এবং দত্তজাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "এটা কিসের কুটনো হবে দাদামশায়?"

দত্তজা বলিলেন, "মাছের ঝোল হবে।"

কৈলাসী বলিল, "ঝোলের আলু এত ছোট ছোট কুটেছ কেন?"

যেন বিরক্তির সহিত দত্তজা বলিলেন, "কে জানে ছোট কি বড় কুটতে হয়। দিব্যি ভাতে ভাত রেঁধে খাচ্ছিলাম, কোথা হ'তে এক পাপ এসে জুটেছে, তাব মাছ চাই, মাছের ঝোল চাই। যেন কত নবাবপুত্তুর। এই যে আজ ভাত একটু ধরে গিয়েছে, খেতে বসে কত নাক মুখ সেঁটকাবে। হয় তো খাবেই না।"

কৈলাসী বলিল, "তা হ'লে বাবুর তরে আবার ভাত চড়াবে নাকি?"

ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া দত্তজা বলিলেন, "হাঁ, চড়াব বৈকি। আমি তার বাবার চাকর কি না, দু'বেলা পরিপাটী ক'রে রেঁধে

বাবুর কোলে ভাতের থালা ধরে দেব। এই খেতে হয় খাবে, না হয় উপোস থাকবে।"

কৈলাসী বলিল, "উপোস থাকবেই বা কেন। অত বড় ছোকরা, রেঁধে খেতে পারে না? তুমি বুড়ো মানুষ বেঁধে দেবে তবে খাবে?"

ভাতের ফেন ঝাড়িতে ঝাড়িতে দত্তজা বলিলেন, "শুধু খাবে? খেতে বসে খুটিনাটি কত; এই ঝোলটা পান্‌সে হ'য়ে গিয়েছে, ডালে নুন কম, অম্বলে আর একটু গুড় দিলে ভাল হ'তো। আমার তো সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যায়, কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারি না, যদি কিছু মনে করে। ভজা মাঝে মাঝে দু' একটা পষ্ট জবাব দেয়, এই তার সঙ্গে খিটিমিটি লেগে যায়। আমি শেষে দু'জনকেই কাকুতি মিনতি ক'রে ক্ষান্ত করি। আমার বিষম পাপের ভোগ হয়েছে কৈলাসী, বিষম পাপের ভোগ।"

ঈষৎ হাসিয়া কৈলাসী বলিল, "তুমি সাধ ক'রে এই ভোগ ভুগচো কেন দাদামশায়? এ পাপ বিদেয় করলেই তো পার!"

মাথা নাড়িয়া দত্তজা বলিলেন, "তা খুব পারি। কিন্তু পাপ বিদেয় হয় কৈ, আর যাবেই বা কোথায়? তিন কূলে কেউ আছে কি? আর আমারও কি জানিস্, আপন বল্‌তে তো কেউ নেই; মলে পিণ্ডী দেওয়া চুলোয় যাক, এক ফোঁটা চোখের জল কেউ ফেলবে না। তা নাই ফেলুক, কিন্তু এই যে ঘর বাড়ী, সব দু'দিনে মাঠ হয়ে যাবে। তাই মনে কচ্চি, ও

ছোঁড়াকে যদি স্থিতু ক'রে যেতে পারি, তবু ভিটেটায় সন্ধ্যে পড়বে। এই আশাতেই ওর সব আবদার সয়ে যাচ্চি।"

কৈলাসী জিজ্ঞাসা করিল, "আর সেই আশাতেই তোমার কাশী যাওয়া হ'লো না।"

ঝোলের আলুগুলা কড়ায় ফেলিয়া নাড়িতে নাড়িতে দত্তজা বলিলেন, "ঠিক যে তারি জন্যে যাওয়া হলো না তা নয়। রমারও একান্ত জেদ, খুড়ো তুমি থেকে কাজটা নির্ব্বাহ ক'রে যাও। আর সকলেই বললে, চৈত মাসে লোকে বেরাল কুকুর-টাকেও বিদেয় করে না, আর তুমি দেশ ছেড়ে যাবে? এই সব পাঁচ কারণেই বুঝলি কি না কৈলাসী, এ মাসটা র'য়ে গেলাম। বোশেখের প্রথমেই তোদের দুর হাত এক ক'রে দিয়ে যা হয় করা যাবে।"

কৈলাসী লজ্জায় মুখখানা লাল করিয়া বঁটি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দত্তজা তাহার দিকে চাহিয়া সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উঠে পড়লি যে? বিয়ের কথায় লজ্জা হ'লো বুঝি?"

"তা বৈ কি, আমার কাজ আছে" বলিয়া কৈলাসী প্রস্থানের উপক্রম করিল; কিন্তু দরজার সম্মুখে যাইতেই থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মাণিক ডাকিল, "দাদামশায়!"

হাস্যতরল কণ্ঠে দত্তজা বলিয়া উঠিলেন, "কে রে, মাণিক? বড্ড সময়ে এসেছিস্ দাদা, তোর ক'নে পালায় ধর ধর্।"

কৈলাসী একবার দত্তজার দিকে আর একবার মাণিকের

দিকে চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, মাণিকের গা ঠেলিয়া ছুটিয়া পলাইল। দত্তজা উচ্চহাসি হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ধর্ ধর্।"

৭

পাহাড়ের কঠিন বক্ষ ভেদ করিয়া নির্ঝরিণীর কোমল ধারা যখন প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন পাহাড়টা যেমন কোনরূপ কঠিনতা দিয়াই তাহার গতিরোধ করিতে পারে না, বরং রোধ করিতে গেলে সে ক্ষীণধারা সহস্রগুণ স্ফীত-কলেবরে প্রপাতের আকারে সুদৃঢ় প্রস্তরময় প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া ভীম গর্জ্জনে প্রবাহিত হয়, কঠোরহৃদয় গোবিন্দ দত্তের অবস্থাও অনেকটা সেইরূপ হইল। স্ত্রীপুত্র বিয়োগের পর হইতে তিনি অন্তরের স্নেহ মমতা করুণা প্রভৃতি যে কোমল বৃত্তিগুলাকে একটা কঠোরতা দিয়া চাপিয়া আসিতেছিলেন, মাণিকের আগমনে বর্ষাবারিস্পর্শে শুষ্ক তটিনীর ন্যায় সেগুলা যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। দত্তজা দৃঢ়তার বাঁধ দিয়া যতই তাহাকে রোধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, ততই তাহা সে বাঁধ ছাপাইয়া তাঁহার অন্তরটাকে প্লাবিত করিতে লাগিল। মাটী যত বেশী শুকনা হয়, জল পাইলে তত বেশী আর্দ্র হইয়া উঠে। দত্তজার প্রাণটাও বড় বেশী শুকনা হইয়াছিল, তাই একটু স্নেহের স্পর্শেই তাহা এত বেশী কোমল হইয়া পড়িল যে, তাহা যেন এই দীর্ঘ পনরো বৎসরের কঠোরতার শোধ সুদে আসলে পোষাইয়া লইতে উদ্যত হইল।

দত্তজা নিজে কিন্তু আপনার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে পারিলেন না, লক্ষ্য করিল ভজহরি। সে একদিন দত্তজাকে বলিল, "তোমার মনটা আজ কাল বড্ড নরম হ'য়ে পড়েছ কত্তা।"

আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে দত্তজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসে বুঝলি রে ভজা ?"

ভজহরি উত্তর করিল, "তোমার গতিক দেখে বুঝতে পাচ্চি কত্তা।"

ঈষৎ রাগতভাবে দত্তজা বলিলেন, "মর বেটা চাষা, কিসে বুঝলি তাই বল্ না।"

মুখ ভার করিয়া ভজহরি বলিল, "তুমি রাগ কর কেনে কত্তা, পষ্ট চোখের ওপর দেখতে পাচ্চি, তবে তো বলছি।"

দত্তজা বলিলেন, "কি দেখছিস্ বল্ তো ?"

ভজহরি বলিল, "কি না দেখচি কত্তা। আগে বাজারে পাঁচ পয়সার জায়গায় সাড়ে পাঁচটা পয়সা খরচ করে এলে রাগে তালপাতার আগুনের মত জ্বলে উঠতে। কিন্তু এখন কে জানে দশ পয়সা, কে জানে বারো পয়সা, বাজার আসচে, তোমার মুখে রা'টী নাই।"

দত্তজা হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দেখ্ ভজা, এই তরেই তোকে বোকারাম বলি। আগে ছিলাম দুজন, তুই আর আমি, এখন তিন জন হয়েছি। দু'জনের বাজারে কি তিনজনের চলে ?"

ঘাড় নাড়িয়া ভজহরি বলিল, "আমি তো বোকারাম বটে

কত্তা, তাই আমাকে বুঝিয়ে দিলে, দু'জনের বাজারে কি তিন জনের চলে। কিন্তু আগে ডাল ভাতে ভাত কে জানে, জল-ঢালা ভাতই কে জানে চলে যেতো। এখন মাছটি চাই, মাছের ঝোলটি চাই, দুবেলা গরম ভাতটী চাই। আগে পূজো আহ্নিক তপ জপের তরে তোমার রান্নার সময় হ'তো না; বলতে, ওরে ভজা, খেলেই নরক, নরকের তরে কি পূজো আহ্নিক বাদ দিয়ে পরকাল খোয়াব? কিন্তু এখন তোমার পরকাল, পূজো আহ্নিক কোথায় রইল কত্তা?"

সহাস্যে দত্তজা বলিলেন, "তুই বলিস্ কিরে ভজা, আমি পূজো আহ্নিক করি না?"

মস্তক সঞ্চালন সহকারে ভজহরি বলিল, "কর, কিন্তু সেটা নামে। আগে নেয়ে এসে বসতে, উঠতে যখন দুপুর গড়িয়ে যেতো। কিন্তু এখন কোশা কুশিটা নিয়ে একবার ঠকঠক না করলে নয় তাই কর। মালা হাতে ক'রে ভাব, সুদের সুদটা কোথায় গেল, কি খাবে, কখন খাবে।"

দত্তজার সহাস্য মুখখানা আষাঢ়ের মেঘের মত গম্ভীর হইয়া আসিল। তিনি ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বিষাদগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "বটে রে ভজা।"

ভজহরি বলিল, "বটে কেনে কত্তা, তোমার আর সেদিন নাই। রাগ কোরো না কত্তা, এই তুমি সব বেচে কিনে কাশী যাবে রটিয়ে দিলে। কিন্তু কোথায় রইল তোমার কাশী, কোথায় রইল বিন্দাবন।"

মুখখানা বিকৃত করিয়া দত্তজা বলিলেন, "তবে আর কি! কাশী গেলেই আমার আর দুটো হাত বেরুবে, না?"

ভজহরি বলিল, "হাত বেরুবে কি না সে কথা তুমিই জান, আর তোমার কাশীই জানে, কিন্তু আমার গাঁয়ে মুখ দেখান ভার হ'য়েছে। পাঁচজনে বলে কি জান—"

বাধা দিয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে দত্তজা বলিলেন, "বলে তোর সাত পুরুষের মাথা। তারা বলছে বলেই আমি এই ভরা চোতে বাড়ী ছেড়ে যাব? আর আমি যাই না যাই, পাঁচজনের কি বল্ তো? আমার খুসী আমি যাব না। এই আমি দিব্যি ক'রে বলছি, কক্ষনো যাব না। দেখি কে আমার কি করে।"

কর্তার রাগ দেখিয়া ভজহরি নিরুত্তর হইল। দত্তজা রাগে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিলেন, "তোদের মুখে এলো বলে ফেললি, কিন্তু যাকে যেতে হবে সেই বোঝে যাওয়ার কি কষ্ট। এই বাপ পিতামহের ভিটে, এই জন্মস্থান, এ সব ছেড়ে যেতে হবে। আপনার বলতে কেউ নাই বটে, কিন্তু এই বেলপুকুর গাঁ-খানা, যাকে ছেলেবেলা হ'তে দেখে আসছি, এই পথ ঘাট, এই সব গাছপালা, তুই কি বুঝবি রে ভজা, এ সব আমার কত আপনার; এদের ছেড়ে যেতে হবে মনে করলেই বুকটা ফেটে যায় যে! নইলে মানিকের মায়া—ধ্যেৎ তোর মায়া।"

পুঞ্জীভূত অশ্রু আসিয়া গলার কাছে এমন জমাট বাঁধিয়া বসিল

যে, দত্তজা আর কথা কহিতে পারিলেন না, শুধু রুদ্ধ নিশ্বাসে বুকটা ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। ভজহরি উঠিয়া আপনার কাজে চলিয়া গেল। একটা পাণ্ডুর মেঘে আকাশের নীলিমা ঢাকিয়া দিয়াছিল; সেই মেঘ-মলিন আকাশের দিকে চাহিয়া দত্তজা স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন।

সত্যই কি তিনি মাণিকের মায়ায় আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন! পুরাণে আছে, মহারাজ ভরত রাজৈশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া তপস্যার জন্য বনে গিয়া এক মাতৃহীন হরিণশিশুকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষে সেই হরিণের মায়ায় এমন আবদ্ধ হইয়া পড়েন যে, তপ জপ পরিত্যাগপূর্ব্বক দিবারাত্র হরিণের চিন্তাতেই নিমগ্ন হইয়া শেষে হরিণ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারও কি শেষে রাজা ভরতের দশা ঘটিবে? শেষ বয়সে বিশ্বনাথকে ভুলিয়া মাণিক মাণিক করিয়া মাণিকজন্ম প্রাপ্ত হইবেন? মন্দ কি, সাত রাজার ধন এক মাণিক; সেই মাণিক হইতে পারিলে ক্ষতি কি? দত্তজার দুঃখের উপর হাসি আসিল।

কিন্তু একটু ভালবাসা, একটু স্নেহ করা, ইহার নাম কি মায়া? তাহা হইলে সংসারে থাকিয়া মায়ার হাত এড়াইবার উপায় তো নাই! একটা অনাথ বালককে একটু স্নেহ যত্ন করিলে, এক মুঠা পেটের ভাত বা একখানা পরণের কাপড় দিলে মায়ার গ্রন্থিটা যদি পাকে পাকে জড়াইয়া যায়, এবং সেই অপরাধে ভগবানের দয়ার রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হইতে হয়,

তাহা হইলে ভগবানও তো দত্তজা অপেক্ষা একটুও কম কৃপণ নহেন। আর ভগবান্ যদি বাস্তবিকই এমন অবিচারক হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পাইবার জন্য কেবল দত্তজা কেন, কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরও আগ্রহ থাকিত না।

বাস্তবিক, ভজহরির কথাগুলা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। সে যে সকল কথা বলিল, তাহা হিংসার বশেই বলিয়াছে। অনেক দিন একা থাকিয়া ভজা বেটা এখন আর মানুষ দেখিতে পারে না। ইহার উপর সেদিন মাণিককে এক জোড়া দেশী ধুতি, তিন টাকা দিয়া এক জোড়া জুতা কিনিয়া দেওয়া হইয়াছে, ইহাতে উহার হিংসা হইয়াছে। আরে হতভাগা, ছেলেটা যদি ছেঁড়া কাপড় ছেঁড়া জুতা পরিয়া বেড়ায়, তাহা হইলে লোকে যে আমাকেই দোষ দিবে; বলিবে, কৃপণ বুড়া ছেলেটাকে একখান কাপড় পর্য্যন্ত দেয় না। তখন ঐ ভজাই হয় তো পাঁচ কথা শুনাইয়া দিবে। আমি কি লোক চিনি না?

ভজার সব চেয়ে অসহ্য হইয়াছে ঐ হাস্যোমিয়মতা। আরে, সাধে কি এক কথায় পঁচিশটা টাকা বাহির করিয়া দিয়াছি। ঐ যে ছোঁড়া পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত, সেটা কি ভাল! পাঁচভূতের সঙ্গে ঘুরিতে ঘুরিতে কোন্ দিন গাঁজা, কোন্ দিন বা মদ ধরিত, আর শেষে পয়সার জন্য বুড়ার বাক্স ভাঙ্গিত। ইহার মধ্যেই তো কত লোকে কত কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তা ছাড়া কত নিত্য নূতন আবদার ছিল। আজ গরবীর দুধের কেঁড়ে ভাঙ্গিয়াছে, দাও একটা টাকা; আজ

ফিষ্টি, দাও আট আনা ; আজ মতি বাগ্দীর ঘরে হাঁড়ি চড়ে না, চারগণ্ডা পয়সা দিতেই হইবে। না দিলেই রাগ, অভিমান, খাওয়া দাওয়া পর্য্যন্ত পরিত্যাগ, শেষে কান্না। কিন্তু হার্ম্মোনিয়ম পাওয়া অবধি আর টুঁ শব্দটী নাই, বাড়ীর বাহিরে পা দেয় না বলিলেই হয়। আরে বেটা কৈবর্ত্তের ছেলে, সাধে কি গোবিন্দ দত্ত এতগুলা টাকা জলে ফেলিয়াছে ? এই এক পঁচিশ টাকায় কত পঁচিশ টাকা বাঁচিয়াছে তাহা অন্যে কি বুঝিবে।

আপনার বুদ্ধিমত্তায় আপনি যথেষ্ট গর্ব্ব অনুভব করিয়া দত্তজ. প্রফুল্লমুখে উঠিয়া পড়িলেন এবং ঘরে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালিয়া মালা লইয়া বসিলেন।

বাহিরের ঘরে মাণিক হার্ম্মোনিয়মে নূতন গৎ সাধিতেছিল। মালা জপিতে জপিতে দত্তজা ডাকিলেন, "মাণিকচন্দর !"

উত্তর আসিল, "কেন দাদামশায় ?"

"এই সময় একটা দেহতত্ত্বের গান ধর দেখি।"

মাণিক হার্ম্মোনিয়মে সুর দিয়া গান ধরিল—

"ভাল বাসিবে ব'লে ভাল বাসিনে।
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে।"

দত্তজা চীৎকার করিয়া বলিলেন, "দূর হতভাগা, এই কি তোর দেহতত্ত্বের গান ?"

মাণিক হাসিয়া উঠিল ; বলিল, "চমৎকার গান দাদামশাই, আগে সবটা শোন।"

"বিধুমুখে মধুর হাসি আমি বড় ভালবাসি"

উচ্চকণ্ঠে ধমক দিয়া দত্তজা বলিলেন, "চুলোয় যাক্ তোর বিধুমুখ! চুপ কর্ আঁটকুড়ীর বেটা।"

মাণিক চুপ করিল; এবং ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পূরবীতে সুর দিয়া ধীরে ধীরে গান ধরিল—

"দিবা অবসান হ'লো কি কর বসিয়ে মন।
উত্তরিতে ভবনদী করেছ কি আয়োজন।"

সুর রেখাব হইতে মধ্যমে, মধ্যম হইতে পঞ্চমে উঠিয়া সান্ধ্য প্রকৃতির বক্ষে তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিতে লাগিল; পূরবীর উদাস গম্ভীর রাগিণী বৃদ্ধের উদাস প্রাণের প্রতি তন্ত্রীতে ঘা দিয়া সমগ্র অন্তরটাকে যেন স্তব্ধ করিয়া ফেলিল। দত্তজা মালা ছড়া ডান হাতে ধরিয়া বাঁ হাত নাড়িয়া তাল দিতে দিতে তন্ময়ভাবে গান শুনিতে লাগিলেন।

সেই দিন রাত্রে খাইতে বসিয়া মাণিক যখন বলিল, "আর গোটা সাতেক টাকা দিতে হবে দাদামশায়।" তখন দত্তজা আশ্চর্য্যান্বিতভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোটা সাতেক টাকা! আবার টাকা কি হবে রে মাণিকচন্দর?"

মাণিক উত্তর করিল, "এক জোড়া বাঁয়াতবলা কিন্‌তে হবে।"

"কেন?"

"কেন কি? সঙ্গত না হ'লে গান মিষ্টি লাগে?"

"বেশ মিষ্টি লাগে। আমি বল্‌ছি, চমৎকার লাগে।"

রোষসূচক মুখভঙ্গী করিয়া মাণিক বলিল, "তুমি বল্‌চো

তবে আর কি। তুমি গানের কি জান যে, কিসে ভাল কিসে মন্দ তা বুঝবে ?”

দত্তজার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল ; কিন্তু তৎক্ষণাৎ আপনাকে সামলাইয়া লইয়া নীরবে মৃদুহাস্য করিলেন। মাণিক বলিল, “বেশী নয়, সাতটা টাকা হ’লেই হবে। যোড়াসাঁকোর ক্লাউনি তবলা একটা চার টাকা পড়বে, বাঁয়া এক টাকা কি পাঁচ সিকে। যাতায়াতের ট্রেন ভাড়া চোদ্দ আনা, আর খাওয়া খরচ গণ্ডা-বারো পয়সা। তা হ’লেই সাত টাকা হ’লো না ?”

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া গম্ভীরস্বরে দত্তজা ডাকলেন, “মাণিকচন্দর !”

মাণিকও গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, “কেন ?”

দত্তজা বলিলেন, “তুমি কি আমাকে টাকার গাছ মনে করেছ যে, নাড়া দিলেই টাকা পাবে।”

মাণিক নতমস্তকে মাথা নাড়তে নাড়তে বলিল, “উঁহু, তুমি টাকার গাছ নও দাদামশায়, তোমার সিন্দুকটা টাকার গাছ, সেটা খুল্‌লেই টাকা পাওয়া যাবে।”

দত্তজা তীব্র দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন ; মাণিক ক্ষিপ্রহস্তে আহার শেষ করিয়া উঠিয়া গেল।

৮

দত্তজা আহারান্তে অন্ধকার দাবায় বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে ভজহরির প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ভজহরি সন্ধ্যার সময়েই বাহিরে গিয়াছিল, এখনও প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই। তাহার জন্য রান্না ঘরে ভাত বাড়া ছিল; সে আসিলে তাহাকে ভাত দিয়া তবে শুইতে যাইবেন। সুতরাং তাহার প্রত্যাগমনে যতই বিলম্ব হইতেছিল, ততই দত্তজা যেন বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন এবং অনুচ্চস্বরে ভজহরির সহিত কৈবর্ত্ত জাতির সপ্তম-পুরুষের উদ্ধারের ব্যবস্থা করিতে করিতে কবে যে তিনি এই যন্ত্রণাময় সংসার ত্যাগপূর্ব্বক বিশ্বনাথের চরণাশ্রয় লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন তাহাই ব্যক্ত করিতেছিলেন। ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘের পাশ দিয়া দুই একটা নক্ষত্র উঁকি দিতেছিল, জ্যোৎস্নার ম্লান আলোক ছায়ার মত উঠানে আসিয়া পড়িয়াছিল; অদূরে অশ্বত্থশিরে বসিয়া একটা পাখী গগনভেদী স্বরে ডাকিতেছিল, "চোখ গেল, চোখ গেল।"

আরে নির্ব্বোধ পাখি, তুই সংসারের এত কি অত্যাচার উৎপীড়ন দেখিয়া কাতর হইয়াছিস্ যাহাতে এমন আকুল কণ্ঠে চীৎকার করিতেছিস্—চোখ গেল, চোখ গেল! যদি আমার মত নির্য্যাতন তোকে সহ্য করিতে হইত, তাহা হইলে তুই আকাশ ফাটাইয়া ডাকিতিস্—বুক গেল, বুক গেল। আরে জ্ঞান-হীন পাখি, মানুষকে যে সংসারের কত নির্ম্মম কশাঘাত সহ্য

করিতে হয়, তাহা বুঝিবার শক্তি তোর কোথায়? তুই আকাশে উড়িয়া বেড়াস্, পৃথিবীর তপ্ত বাতাস অনেক সময়ে তোকে স্পর্শ করিতেও পারে না। গাছের ফলে নদীর জলে ক্ষুৎ পিপাসার নিবৃত্তি হইলেই তুই নিশ্চিন্ত, পরের জন্য চিন্তায় প্রয়োজন তোর নাই। কিন্তু মানুষ—মানুষকে পৃথিবীর এই তপ্ত বাতাসের মধ্যে থাকিয়া শোক দুঃখের কত জ্বালা সহিতে হয়, পরের জন্য কত ভাবনা ভাবিতে হয়, তাহা অবোধ পাখী তুই কি বুঝিবি? মানুষের বড় কঠিন প্রাণ, তাই এত জ্বালা সহিয়াও সে স্থির থাকে। তোর মত ক্ষুদ্র প্রাণ হইলে সে জ্বালার স্পর্শ মাত্রেই পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইত।

কলিকার আগুন নিবিয়া গেল, হুঁকার ছিদ্র দিয়া ধূম বাহির হইল না। সেই ধূমবিহীন অগ্নিশূন্য হুঁকাটা মুখের কাছে রাখিয়া দত্তজা চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। পাখীটা সমান ভাবে চীৎকার করিতে লাগিল, "চোখ গেল, চোখ গেল।"

ভজহরি ধীরে ধীরে বাড়ী ঢুকিল। তাহার আগমনেও দত্তজাকে নিঃশব্দে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সে আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাদে কর্ত্তা, একা আঁধারে বসে কি ভাবতে নেগেচো?"

সচকিত ভাবে দত্তজা বলিয়া উঠিলেন, "কে ভজা এলি?"

ভজহরি হাসিয়া উঠিল; বলিল, "কও কথা কর্ত্তা, দরজা খুলে এলাম, এতক্ষণ তোমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে রয়েছি, আর তুমি বল্‌চো ভজা এলি। তুমি কি ভাবচো কর্ত্তা?"

রুক্ষস্বরে দত্তজা বলিলেন, "ভাবচি তোর মাথা। এত রাত পর্য্যন্ত কোথায় ছিলি হতভাগা? আমি কি তোর বাবার চাকর যে, ভাত আগলে বসে থাকবো?"

একটু ভীতভাবে ভজহরি বলিল, "অমন কথা কয়ো না কত্তা, ওতে আমার অপরাধ হয়। হাজার হোক্ তুমি মনিব, আমি চাকর—"

দাঁত মুখ খিঁচাইয়া দত্তজা বলিয়া উঠিলেন, "সত্যি নাকি। তাই বুঝি বেপরোয়া হ'য়ে এত রাত পর্য্যন্ত আড্ডা দিচ্ছিলে? আচ্ছা, থাম আর দিন কতক, তার পর সব বেটাকেই দেখাচ্ছি, তৈরি ভাতের কত মজা।"

ভজহরি মিনতির সুরে বলিল, "তুমি যে রাগ করবে কত্তা, তা আমি জানি, কিন্তু গারুপালের ছেলের বড্ড ব্যামো, ডাক্তার বদ্দি ডাকবার লোক নাই। তা লোকটা ধরলে, ভজু মামা, গণেশ ডাক্তারকে যদি ডেকে দাও। কি করি কত্তা, এক গাঁয়ে বাস, মুখ এড়ান যায় না তো।"

"তাই তুমি ছুটলে ডাক্তার ডাকতে। জান বুড়ো বেটা আছে, যত রাত্তির হোক ভাত আগলে বসে থাকবে।"

"তুমি রাগ কর কেনে কত্তা, লোকের বিপদ আপদ আছে তো। ধর, কাল যদি আমিই একটা ব্যামোয় পড়ি—"

বাধা দিয়া দত্তজা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "তখন যদি কেউ তোর মুখে—করে ভজা, তবে আমার নাম গোবিন্দ দত্তই নয়।"

ভজহরি বলিল, "তুমি বড্ডই রেগেছ কত্তা, কলকেটা পাল্টে দিই।"

বলিয়া সে কলিকা লইবার জন্য হাত বাড়াইল। দত্তজা হুঁকা সরাইয়া লইয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "আর তোমার দরদ দেখাতে হবে না, এখন বাপের সুপুত্র হ'য়ে ভাত খেয়ে আমাকে রেহাই দাও।"

বলিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন, এবং ভাতের থালা আনিয়া রান্না ঘরের দাওয়ায় ধরিয়া দিলেন। ভজহরি কলিকা লইয়া তামাক সাজিল, এবং তাহাতে আগুন ঠিক করিয়া দিয়া খাইতে বসিল। অদূরে দত্তজা বসিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন।

খাইতে খাইতে ভজহরি বলিল, "গণেশ ডাক্তার কি চামার, কত্তা?"

"কেন রে ভজা?"

"তিন তিন বার ছুটোছুটী কল্লুম, পায়ে পর্য্যন্ত ধরলুম, কিন্তু তার সেই এক কথা, আগে টাকা নিয়ে এস, তার পরে যাব। ডাক্তার হ'লে কি চোখের পর্দ্দা থাকে না।"

"ব্যাবসা কত্তে গেলে কি চোখের পর্দ্দা রাখলে চলে?"

"অমন ব্যাবসার মুখে আগুন। আহা, পালের পোর কি কাতরানি! ঐ একটা ছেলে, ছেলে তো নয়, যেন অসুর অবতার। দেখলে বুক ফেটে যায় কত্তা, কিন্তু ডাক্তার বেটার একটু দরদ হলো না গা।"

দত্তজা গম্ভীরভাবে বলিলেন, "হুঁ, দরদ হবে! ওরে ভজা, চাষার সব বেটাই, ধরা পড়েছে শুধু সুদখোর মহাজনেরা।"

"তাই বটে" বলিয়া ভজহরি ধীরে ধীরে আহার কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া দত্তজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলেটা বাঁচবে, না মরবে রে?"

আক্ষেপসূচক স্বরে ভজহরি বলিল, "আর বাঁচবে! দু' ফোঁটা ওষুধ পেলেও তবু বুঝতে পারতো। এখন ভগমান যদি বাঁচান তবেই।"

"হাঁ, ভগবান্ ঐ হারা পালের ছেলেকে বাঁচাবার তরে হাত ধুয়ে বসে আছে। তুই তো দেখেছিস্, মণে ছোঁড়াকে যে দিন ডাক্তারে জবাব দিয়ে গেল, সেদিন ঠাকুরের দরজায় মাথা কুটে রক্তপাত করেছি। কিন্তু ঠাকুর এই সুদখোর কশাইদের চাইতেও দিব্যি চোখ বুজে বসে রইলো নাকি?"

তরল মেঘাবৃত আকাশের দিকে চাহিয়া দত্তজা জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, এবং হুঁকায় কয়েকটা টান দিয়া বলিলেন, "হাঁরে ভজা, হারা বেটার ঘরে কি দুখানা পেতল কাঁসাও নাই?"

"থাকলে কি আর চুপ করে থাকে কত্তা। বাকী খাজনার দায়ে জমিদার ওর সর্ব্বস্ব বেচে নিলে না? পাতা কেটে ভাত খাচ্চে। এবছর ফসলটা পেলে একটু সামলাতে পারতো, কিন্তু যে খাটবে সেই তো যায় যায়।"

দত্তজা ঈষৎ শ্লেষতীব্রস্বরে বলিলেন, "তোর তো দেখচি বড্ড দরদ; তা তুই বেটাই দু'পাঁচ টাকা দিলি না কেন?"

গর্জ্জন করিয়া ভজহরি বলিল, "আমার টাকা থাকলে তোমাকে বলতে হ'তো না কর্ত্তা। কিন্তু ভগবান এমন সব মানুষের হাতে পয়সা দেয়, যাদের হাত দিয়ে জল সরে না।"

দত্তজা বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ভজহরি কথাটা বলিয়াছে। কিন্তু ইহাতে তিনি একটুও ক্রুদ্ধ না হইয়া হাসিয়া বলিলেন, "তোরাই দাতা কর্ণ হেন রে ভজা, যে বেটাদের বাতাসে হাঁড়ি নড়ে। বেটারা আর কিছু পারে না, কেবল যাদের দু'পয়সা আছে তাদের হিংসায় ফেটে মরে। মুখে আগুন, মুখে আগুন!"

ভজহরি নীরবে তাহার কার্য্য শেষ করিতে লাগিল। দত্তজা হুঁকায় একটা জোর টান দিয়া হুঁকা রাখিয়া বলিলেন, "চুপ করে রইলি যে ভজা?"

গম্ভীর ভাবে ভজহরি উত্তর করিল, "কি আর করবো কর্ত্তা।"

দত্তজা বলিলেন, "আর কিছু না হয় পাঁচটা উপদেশ দিতে ত পারিস্। এই ধর যেমন পরের উপকার করা মহাপুণ্য, মানুষের বিপদে সাহায্য করলে ভগবান ভাল করেন।"

ভজহরি বলিল, "আমরা ছোট লোক, পাপপুণ্যির কি জানি।"

সহাস্যে দত্তজা বলিলেন, "সে কি রে ভজা, আজ কাল বড় লোকদের চাইতে ছোট লোকদেরই ধর্ম্মজ্ঞান যে বেশী। এমন মোগল পাঠান হদ্দ হ'লো পার্শী পড়ে তাঁতি।"

বলিয়া তিনি হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বিরক্তভাবে

ভজহরি বলিল, "তুমি হাসচো কত্তা, কিন্তু যার বিপদ সেই জানে। আহা, পুত্তুর শোক যে কি বিষম, তা যার হয় সেই বুঝে।"

ব্যগ্রতার সহিত দত্তজা বলিলেন, "সত্যি নাকি রে ভজা, পুত্তুর শোক এত বিষম আমি তা জানতাম না।"

ভজহরি বলিল, "তুমি কি না জান কত্তা? জান সব, আবার যেন কিচ্ছু জান না। তোমাকে কি আমি চিনি না কত্তা?"

দত্তজা হাসিয়া বলিলেন, "তাই নাকি? আমাকে তা হ'লে চিনেছিস্?"

ভজহরি বলিল, "বেশ চিনেছি। না চিনলে একা দমে তোমার কাছে বিশ বছর কাটাতে পারি?"

দত্তজা বলিলেন, "সেটা আমার চোদ্দ পুরুষের ভাগ্য বলতে হবে?"

ভজহরি আহার শেষ করিয়া উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিল। তারপর দত্তজার প্রসাদী কলিকায় দুইটা টান দিয়া শয়নের উদ্যোগ করিলে দত্তজা তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "শুতে যাচ্চিস্ ভজা?"

ভজহরি ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, কিছু কাজ আছে নাকি?"

দত্তজা তীব্র বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন, "কাজ আবার নাই? আমার ঘরে কত কাজ! সকাল হতে রাত দুপুর পর্য্যন্ত খেটে খেটে মারা গেলি ভজা। ইঃ, বেটা যেন কত কাজের লোক!"

প্রভুর উক্তির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া ভজহরি

হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। দত্তজা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "বলি, হারা পালের এমন বিপদ, আর তুই শুতে যাচ্চিস্? একবার যাবি না?"

ভারী মুখে ভজহরি বলিল, "গিয়ে করবো কি? থাকতো হাতে দু'টো টাকা, যা হয় কত্তাম।"

মুখ বিকৃত করিয়া দত্তজা বলিলেন, "এই বেটা কাঁদুনি আরম্ভ করলে। আরে বেটা, টাকা হাতে নাই ব'লেই এত দান খয়রাত খরচ পত্র কত্তে পারিস; কিন্তু হাতে থাকলে যদি খরচ কত্তে পারতিস্, তবে জানতাম বাপের বেটা। বুকের পাটা চাইরে ভজা, বুকের পাটা চাই। সে বুকের পাটা কি তোর মত কৈবর্ত্তের ছেলের আছে।"

বলিয়া দত্তজা উঠিয়া ঘরে ঢুকিলেন, এবং অনতিবিলম্বে ভজহরিকে সম্পূর্ণ আশ্চর্য্যান্বিত করিয়া, তাহার সম্মুখে তিনটা টাকা ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, এই নে টাকা। কিন্তু হারার ছেলে যদি না বাঁচে, তবে তোরি একদিন, কি আমারি একদিন।"

ভজহরি অতিমাত্র বিস্ময়ে দৃষ্টিটা বিস্ফারিত করিয়া প্রভুর মুখের দিকে চাহিল, তারপর টাকা তিনটা তুলিয়া লইয়া ট্যাঁকে গুঁজিল। দত্তজা তর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "মর বেটা, হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলি যে? কোন্ চুলোয় যাবি যা না।"

ভজহরি বিস্ময়োৎফুল্ল দৃষ্টিটা একবার প্রভুর মুখের দিকে নিক্ষেপ করিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। দত্তজা দরজা বন্ধ করিয়া শয়ন করিলেন।

সকালে ভজহরি গরুকে খাবার দিতেছিল, এমন সময় দত্তজা আসিয়া গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো বাবু, কখন্ শুভাগমন হ'লো?"

ভজহরি গরুর ডাবায় বিচালি দিতে দিতে উত্তর দিল, "এই আসচি কত্তা, সারাটা রাত কি চোখে পাতায় হ'য়েচে? উঠানে পড়ে মশা চাপড়েচি।"

দত্তজা বলিলেন, "বেশ করেছ। ছেলেটা কেমন আছে?"

ভজহরি বলিল, "অনেকটা সুবিধে কত্তা, ডাক্তার এয়েছিল, ওষুধ দিয়ে গেছে।"

দত্তজা গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিলেন, "বটে।"

ভজহরি বলিল, "পালের পো টাকা পেয়ে কত সুখ্যাত করলে কত্তা, ধন্যি ধন্যি কত্তে লাগলো।"

দত্তজা ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "তবে তো আমার স্বর্গ হতে রথ নেমে এলো। গাঁটের পয়সা দিতে পারলে অনেক বেটাই এমন ধন্যি ধন্যি করে।"

বলিয়া তিনি বিরক্তভাবে মুখ ফিরাইয়া লইলেন, এবং গাড় হাতে অগ্রসর হইতে হইতে বলিলেন, "কিন্তু এই দেখ্ ভজা, তোকে বলে রাখছি, পরশু হ'লো সংক্রান্তি, সাতুই মাণিকের বিয়ের ঠিক করেছি। তারপর বিশে নাগাদ আমি রওনা হচ্চি। এর ভেতর যদি বাড়ীর বাইরে একটা পা দেবে তবে ভালই

হবে না বল্‌ছি। সব যোগাড় পত্র হাট বাজার কত্তে হবে তো।”

বলিয়া দত্তজা দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। ভজহরি আপন মনে গজ্‌ গজ্‌ করিতে করিতে গরুকে খাবার দিতে লাগিল।

৯

গ্রামের মধ্যে যে সকল লোক গোবিন্দ দত্তের পয়সা দেখিয়া হিংসা করিত, তাহাদের মধ্যে দাশরথি ঘোষ প্রধান। এই দাশরথি ঘোষ আর গোবিন্দ দত্ত যখন গোপাল হাজরার পাঠশালায় পড়িত, তখন দুই জনে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। তারপর কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পর গোবিন্দ দত্তের আর্থিক অবস্থা যখন ক্রমেই সচ্ছল হইয়া উঠিতে লাগিল, এবং দাশরথি ঘোষ বহু চেষ্টাতেও সংসারের অসচ্ছলতা দূর করিতে পারিল না, তখন হইতেই উভয়ের বন্ধুত্বের বন্ধন ক্রমেই শিথিল হইয়া আসিল। এক পাঠশালায় এক গুরুমহাশয়ের নিকট দুইজনেই শিক্ষালাভ করিয়াছে, শিক্ষাকালে স্বীয় বুদ্ধিমত্তা প্রভাবে দাশরথি বরং অধিকতর কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, আর আজ কার্য্যক্ষেত্রে আসিয়া সে পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িল, ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় কি আছে। সেও মানুষ, গোবিন্দ দত্তও মানুষ; তবে গোবিন্দ দত্ত এত বড় হইয়া উঠিল কেন, আর তাহার বড় হইবার চেষ্টা কেনই বা ব্যর্থ হইয়া গেল? ইহা নিশ্চয়ই বিধাতার অবিচার। কিন্তু এই পক্ষপাতিত্বের জন্য অবিচারক বিধাতার

কিছুই করিবার উপায় যখন নাই, তখন তাহার সব রাগটা গোবিন্দ দত্তের উপরেই পড়িল, এবং গোবিন্দ দত্তের এই অস্বাভাবিক উন্নতির জন্য বিধাতার নিকট অনুযোগ করিতে লাগিল।

কিন্তু তাহার রাগে বা অনুযোগে যখন গোবিন্দ দত্তের কোনই ক্ষতি হইল না, তখন সে অনেক চিন্তার পর ইহাই স্থির করিয়া লইল যে, গোবিন্দ দত্তের এই উন্নতির মূলে সম্পূর্ণ অধর্ম্ম নিহিত রহিয়াছে। একে তো কলিকাল, অধর্ম্ম না করিলে পয়সা হয় না; তাহার উপর গোবিন্দ দত্ত সুদের সুদ খাইয়া এত পয়সা জমাইয়াছে। সুদ খাওয়া যে মহাপাপ ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। দাশু ঘোষ প্রাণ থাকিতে এমন পাপ করিতে পারিবে না, সুতরাং তাহার পয়সাও হইবে না। না হউক, সে ভিক্ষা করিয়া খাইবে, তথাপি এমন পাপের পয়সা লইয়া বড়মানুষ হইতে পারিবে না।

ধার্ম্মিক লোক যাঁহারা, তাঁহারা পাপীর অনিষ্ট করেন না, বরং তাহার উপকারই করিয়া থাকেন। সুতরাং মহাপাপী গোবিন্দ দত্তের পাপের ফলে যখন পত্নীবিয়োগ হইল, তখন তাঁহাকে সংসারধর্ম্মে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য দাশু ঘোষ চেষ্টা করিতে লাগিল, এবং আপনার ত্রয়োদশবর্ষীয়া কন্যা রুক্মিণীকে তাঁহার হস্তে প্রদান করিতে উদ্যত হইল। দত্তজা কিন্তু তাহার পরোপকার-প্রবৃত্তিপূত দান গ্রহণ করিতে পারিলেন না। পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়া কেবল মায়া-বন্ধন নয়, অধিক অপচয় হইতেও ভীত হইয়া তিনি এই কার্য্যে অস্বীকৃত

হইলেন। দাশু ঘোষ কিন্তু এসব বুঝিল না; তাহার মেয়ে বলিয়াই যে গোবিন্দ দত্ত বিবাহে অস্বীকৃত হইল ইহাই স্থির করিয়া লইয়া সে গোবিন্দ দত্তের উপর আরও বেশী রাগিয়া উঠিল, এবং এই সুদখোর লোকটার মত অসাধু ও কৃপণ যে দুনিয়ায় আর দ্বিতীয় নাই ইহা প্রচার করিতে থাকিল।

কিন্তু মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে দাশু ঘোষের যখন সমাজচ্যুত হইবার উপক্রম হইল, সেদিন সে নিরুপায় হইয়া একশত টাকার জন্য এই কৃপণ অসাধু লোকটারই দ্বারস্থ হইল। তাহার কাতরতা দর্শনে সুদখোর গোবিন্দ দত্তের অতি কঠোর প্রাণটাও কোমল হইয়া আসিল। তিনি বিনা-লেখাপড়ায় শুধু খাতায় একটা সহি লইয়াই দাশু ঘোষকে এক শত টাকা ধার দিলেন।

তারপর আপনার অবস্থার অসচ্ছলতা নিবন্ধন সে টাকা শোধ দিতে অসমর্থ হইলে গোবিন্দ দত্ত যখন আদালতের সাহায্যে টাকা আদায় করিয়া লইলেন, তখন দাশু ঘোষ প্রকাশ্যে পাঁচ জনের নিকট গোবিন্দ দত্তের নিন্দা না করিয়া থাকিতে পারিল না। গোবিন্দ দত্ত এক সময়ে তাহার উপকার করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে উপকারের শোধ কি এমনি করিয়া লইতে হয়? যাহার টাকার অভাব নাই, টাকায় ছাতা ধরিয়া যাইতেছে, ভোগ করিবার লোক নাই, তাহার কি এমন ভাবে নালিশ দরবার করিয়া জমি জমা বেচিয়া টাকাটা আদায় করা ন্যায়সঙ্গত কাজ হইয়াছে? এই একশত টাকা তাহার কাছে দশ বৎসর

পড়িয়া থাকিলে গোবিন্দ দত্তের কি এমন ক্ষতি হইত? সে কি খাইতে পাইত না? আর দাশু কি টাকাটা না দিয়া তাহার কাছে ঋণী হইয়া থাকিত? ছেলেটা ছাপাখানায় কাজ শিখিতেছে; কাজ শিখিলেই আট দশ টাকা মাহিনা হইবে। তখন তো অনায়াসেই মাসে দুইটা করিয়া টাকা ফেলিয়া দিলে চারি বৎসরে সব শোধ হইয়া যাইত। কিন্তু গোবিন্দদত্ত লোকটা এমনই স্বার্থপর যে, সে তাহার মুখের দিকে না তাকাইয়া তাড়াতাড়ি টাকাটা আদায় করিয়া লইয়া আপনার সিন্দুকে পূরিল। এই পাপেই তো উহার বংশলোপ হইয়াছে। টাকাই কি থাকিবে, কোন্ দিন সব অগ্নিদেবের উদরসাৎ হইবে, অথবা উহার মৃত্যুর পর পাঁচ ভূতে লুটিয়া খাইবে। এরূপ অধার্ম্মিক স্বার্থপর ব্যক্তির কাছে কোন ভদ্রলোকে কি টাকা ধার করিতে যায়?

এ সকল কারণ ছাড়া দাশু ঘোষের রাগের আরও একটা প্রধান কারণ ছিল। গোবিন্দ দত্তের নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়া সে অন্যত্র রুক্মিণীর বিবাহ দিয়াছিল; বিবাহের বছর তিন পরেই মেয়েটা বিধবা হইয়া বাপের বাড়ীতে আসিল। কিন্তু এমনই অদৃষ্ট, মেয়েটা একটা তামার পয়সা লইয়া আসিল না; হতভাগ্য জামাতা সঞ্চয়ের পরিবর্ত্তে যে দেনা রাখিয়া গিয়াছিল, মহাজনে ঘর ভিটা বেচিয়া তাহার শোধ লইল। হায়, গোবিন্দ দত্তের সঙ্গে যদি রুক্মিণীর বিবাহ হইত, এবং তারপর সে আজ এমনই বিধবা হইয়া ঘরে আসিত, তাহা হইলে আজ তাহাকে পায় কে; সে তো দশ বিশ হাজার টাকার মালিক। মেয়েটার অদৃষ্টে

যখন বৈধব্যযোগ আছে, তখন আয়ু থাকিলেও গোবিন্দ দত্তকে মরিতেই হইত, এবং মেয়েটার অদৃষ্টের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিজের অদৃষ্টচক্রও যে অস্বাভাবিকরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। হায়, হতভাগ্য গোবিন্দ দত্ত তাহার এরূপ অবশ্যম্ভাবী শুভাদৃষ্টের পথে কাঁটা ছড়াইয়া দিল! রাগে দাশু ঘোষ নিজের হাত নিজে কামড়াইতে লাগিল। হায়, এই স্বার্থপর বুড়া কবে মরিবে? কবে তাহার সিন্দুকের টাকাগুলা লইয়া পাঁচ ভূতে ছিনিমিনি খেলিবে।

গোবিন্দদত্ত কিন্তু মরিল না, বা তাহার টাকা লইয়া পাঁচ ভূতে ছিনিমিনি খেলিল না; তাহার পরিবর্ত্তে কোথা হইতে মাণিকলাল উত্তরাধিকারী রূপে আবির্ভূত হইল। ইহার পর দাশু ঘোষ যখন শুনিল যে, রমা সরকারের মেয়ে কৈলাসীর সঙ্গে মাণিকের বিবাহ দিয়া তাহাকে ঘরে রাখিয়া গোবিন্দ দত্ত সচ্ছন্দ চিত্তে কাশীবাসী হইবে, তখন দাশু ঘোষের চিত্তে কিরূপ অস্বাচ্ছন্দ উপস্থিত হইল তাহা তাহার অন্তর্য্যামী ছাড়া আর কেহই বুঝিবে না। উঃ, এতদিন পরে কোথা হইতে ভাগ্নীর ছেলে নাতি—সে বিষয়ের অধিকারী হইবার জন্য উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিল; আর তাহাকে সংসারী করিয়া বুড়া নিশ্চিন্তমনে কাশীবাস করিতে চলিল। সুদখোর অধার্ম্মিক লোকের এমন সুখময় পরিণাম, ভগবানের রাজ্যে ইহা কি সহ্য হইবে? ভগবান্ কি এত অবিচারক! ভগবানের ন্যায় বিচার দেখিবার জন্য দাশু ঘোষ আগ্রহান্বিত হইল।

কিন্তু ভগবান্ তো নিজে কিছু করেন না, মানুষকে প্রতিনিধি স্বরূপে রাখিয়া তিনি সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। দাশু নিজে প্রতিনিধি হইয়া ভগবানের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে যত্নবান্ হইল।

ভগবানের কার্য্যে ভগবানই সহায় হইয়া থাকেন। তাঁহার কৃপায় দাশু ঘোষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির সুযোগ প্রাপ্ত হইল। তাহার পুত্র রাইচরণ কলিকাতায় কোন ছাপাখানায় কম্পোজিটারের কাজ করিত। মাহিনা বারো টাকা হইলেও তাহার যে তেড়া ছিল, জনৈক হিসাবনবিশ হিসাব করিয়া বলিয়াছেন, তাহার দাম অন্ততঃ চার বারং আটচল্লিশ টাকা। পরিচ্ছদাদিও অনেকটা এই তেড়ারই অনুরূপ ছিল সূক্ষ্ম কৃষ্ণবস্ত্রের আগুলফলম্বিত পাঞ্জাবী, জ্যৈষ্ঠের নিদারুণ গ্রীষ্মের দিনেও পায়ে ফুল মোজা, তাহার উপর আলবার্ট সু, হাতে তিনটাকা দামের রিষ্ট ওয়াচ, এ সকল সাজসজ্জা দেখিয়া গ্রামের রমণীবৃন্দ যখন বিস্ময়-চমকিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিত, তখন রাইচরণ আপনার বেশভূষার পারিপাট্যে আপনি মুগ্ধ হইয়া সগর্ব্ব দৃষ্টিতে বারবার স্বীয় পরিচ্ছদের ত্রুটিহীনতা লক্ষ্য করিতে ব্যস্ত হইত। আর সৌখীন যুবকের দল থিয়েটারের নূতন নূতন গান শুনিবার আশায় তাহার আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইত।

সেবার ছুটিতে রাইচরণ দেশে আসিলে সঙ্গীতপ্রিয় মাণিক-লাল তাহার সঙ্গ লইল, এবং এই সূত্রে দাশু ঘোষের বাড়ীতে তাহার নিয়ত যাতায়াত হইতে লাগিল। দাশু ঘোষ সুদখোর গোবিন্দ

দত্তের উপর প্রসন্ন না থাকিলেও তাঁহার সুদের সুদকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। এমন কি, রুক্মিণী পর্য্যন্ত তাহার সহিত হাস্যপরিহাস করিতে থাকিল। রুক্মিণীর রূপের গৌরব ততটা না থাকিলেও যৌবনের গৌরব যথেষ্ট ছিল। সুতরাং তাহার হাস্য পরিহাসটা মাণিকের কাছে অপ্রীতিকর হইল না, বরং অনেকটা লোভনীয় হইয়াই উঠিল। সুতরাং দিনের অধি-কাংশ সময় সে দাশু ঘোষের বাড়ীতেই কাটাইতে আরম্ভ করিল। দাশুও ইহাতে কোন আপত্তি করিল না, বরং তাহার সঙ্গে ঠিক বাড়ীর ছেলের মত ব্যবহার করিতে লাগিল।

মাণিকের সহিত হাস্য পরিহাস করিলেও রুক্মিণীর মনের ভিতর যে কোনরূপ মালিন্য ছিল এমন কথা বলা যায় না; সমবয়স্কের সহিত অবাধে যেরূপ ব্যবহার করা যায়, মাণিকের সঙ্গেও ঠিক সেইরূপ ব্যবহারই করিত; এবং এমন ব্যবহারের মধ্যে যে কিছু দোষ থাকিতে পারে, এরূপ সন্দেহও তাহার মনে আদৌ আসিত না। নিজের মনে সন্দেহ না থাকিলেও তাহাতে অপরের মনে সন্দেহ জন্মিতে পারে এমন আশঙ্কাও সে কোন দিন করে নাই, এবং তাহার এই সঙ্কোচশূন্য ব্যবহারে অন্যের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি যে আকৃষ্ট হইতে পারে ইহা একবার ভাবিয়াও দেখে নাই।

রুক্মিণী না ভাবিলেও পাড়ার দুই একটী প্রবীণা—যাঁহারা বয়োধর্ম্মে নবীনাদের মনোভাবগুলা নখদর্পণে রাখিয়া দিয়াছেন এবং হাই তুলিলেই ব্যাদিত মুখগহ্বরের মধ্য দিয়া লোকের পেটের নাড়ীগুলা পর্য্যন্ত দেখিয়া লইতে পারেন, তাঁহারাই প্রথমে

রুক্মিণীর কথা ভাবিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহাদের সেই চিন্তা সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় পল্লীমধ্যে যতই ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, ততই সকলের সতর্ক দৃষ্টি রুক্মিণী ও মাণিকের উপর বেশী বেশী পড়িতে লাগিল।

১০

"আজি এসেছি আজি এসেছি, এসেছি বঁধু হে
নিয়ে এই হাসি রূপ গান।
আমার যা কিছু আছে, এনেছি তোমার কাছে
তোমায় করিতে সব দান।"

স্তব্ধ মধ্যাহ্নে পাখীগুলা পর্য্যন্ত যখন গাছের পাতার পাশে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, নিস্তব্ধ পল্লীর উপর দিয়া রৌদ্রের তপ্ত ঝলকের সঙ্গে তপ্ত বাতাসটা থাকিয়া থাকিয়া বহিয়া যাইতেছিল, তখন দাশু ঘোষের বাহিরের ঘরে তক্তাপোষের উপর বসিয়া মাণিক এসরাজের তারে ছড়ি টানিতে টানিতে গানটা ঠিক মত বাজাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিল। অদূরে মেঝের উপর বসিয়া রুক্মিণী মুগ্ধ বিহ্বলচিত্তে এই নূতন সুরের নূতন গান শুনিতেছিল। রাইচরণ সেই দিন সকালে কলিকাতা যাত্রা করিয়াছিল। রুক্মিণীর মা আহারান্তে গালে দোক্তা ও কোলে ছেলে লইয়া পল্লীভ্রমণে বাহির হইয়াছিল; দাশু বাড়ীর ভিতর দিবানিদ্রার আরাধনা করিতেছিল। রুক্মিণী একা মাণিকের সম্মুখে বসিয়া গান শুনিতেছিল।

গানটা তাহার ভাই রাইচরণ প্রথম আমদানী করিয়াছিল। এই নূতন আমদানী গানটা রুক্মিণীর এত মিষ্ট লাগিয়াছিল যে, অনেকবার সে বাহিরের ঘরের জানালার পাশে আড়ি পাতিয়া শুনিতে যাইত। কিন্তু রাইচরণ জানিতে পারিলেই ধমক দিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিত; অগত্যা তাহাকে অতৃপ্ত কৌতূহল লইয়া ফিরিয়া যাইতে হইত। আজ রাইচরণ না থাকায় রুক্মিণী অবাধে আপনার কৌতূহল নিবৃত্ত করিয়া লইবার সুযোগ পাইয়াছিল। মাণিক গাহিতেছিল—

"তোমার নয়নতলে শয়ন লভিব ব'লে
আসিয়াছি তোমার নিদান;
এমন চাঁদের আলো মরি যদি তাও ভালো
সে মরণ স্বরগ সমান।"

গানের সঙ্গে সঙ্গে সেই রৌদ্রদগ্ধ মধ্যাহ্নে রুক্মিণীর মানস-নেত্রের সম্মুখে যেন চাঁদের আলো ফুটিয়া উঠিয়াছিল; আর সেই চন্দ্রমাশালিনী নিশীথিনীতে যেন কোন্ অতৃপ্তহৃদয়া বিরহিণী বহুকাল পরে তাহার আকাঙ্ক্ষার ধনকে পাইয়া তাহার নয়ন সমক্ষে স্বর্গের ন্যায় সুখকর মরণকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইয়াছিল। আহা, কি সুখের মৃত্যু সে! যাহাকে চাই, অথচ পাই না, পাইয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারি না, তাহার পদ-প্রান্তে পড়িয়া, নয়নে নয়ন রাখিয়া, মধুর জ্যোৎস্নাসমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়া যাওয়া কি প্রার্থনীয় দিন! সেই দিনের স্মৃতিতে রুক্মিণীর

সারা বুকটা যেন আলোড়িত হইতে লাগিল. চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিল।

গান শেষ করিয়া মাণিক ডাকিল, "রুক্মিণী ঠাকরুণ!"

রুক্মিণী যেন স্বপ্নোত্থিতার ন্যায় চমকিতভাবে ফিরিয়া চাহিল।

মাণিক জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন গান বল দেখি?"

মুগ্ধকণ্ঠে রুক্মিণী উত্তর করিল. "সুন্দর!"

কাঁধ হইতে এসরাজটা নামাইতে নামাইতে মাণিক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, তোমার দাদাও তো এই গানটা গাইতো, আমার মুখেও আজ শুনলে। কোনটা বেশী মিষ্টি বল দেখি?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া রুক্মিণী বলিল, "দাদাও মন্দ গাইতেন না। তবে—"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মাণিক বলিল, "তবে আমারটাই বুঝি মন্দ হ'লো?"

রুক্মিণী বলিল, "মন্দ নয়; দাদার চাইতে তোমার গলা মিষ্টি।"

এসরাজটা তক্তাপোষের উপর রখিয়া মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক মাণিক বলিল, "আরে, গলা তো মিষ্টি হবেই, আমার যে সাধা গলা। যাত্রার দলে ওস্তাদের কাছে দস্তুরমত গলা সাধতে হয়েছে।"

বিস্ময় সহকারে রুক্মিণী জিজ্ঞাসা করিল, "গলা সাধা আবার কি?"

মাণিক। সুরের সঙ্গে গলা ঠিক করা। সা রে গা মা পা ধা নি এই সাতটা হচ্চে সুর, এগুলাকে গলা দিয়ে বের করতে হবে। যেমন ধর, সা—রে—গা—মা,—সা রে গা, রে গা মা, গা মা পা।

রুক্মিণী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। মাণিক রাগে মুখখানাকে একটু বিকৃত করিয়া বলিল, "তুমি কিছু জানো না, তাই হেসে ফেল্‌লে, কিন্তু এই সা রে গা মা নিয়ে গলা না সাধলে গানই হয় না। গাইলে সে বেসুরো হয়। তুমি তো জানো না, যাত্রার আসরে যখন একটা গান ধরেছি, তখন হাজার হাজার লোক আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকতো কেন ?"

রুক্মি। চেয়ে চেয়ে তোমার মুখখানা দেখতো।

মাণি। ধ্যেৎ, আমার মুখ দেখতে যাবে কেন ? আমার মুখে কি আছে ?

রুক্মি। তোমার মুখে—

যেন তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎস্পর্শে রুক্মিণীর সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। বক্তব্য শেষ না করিয়াই সে উঠিয়া দাঁড়াইল। মাণিক জিজ্ঞাসা করিল, "উঠলে যে ? সেই গানটা শুনবে না ? সেই বহুদূর হ'তে এসেছি বঁধু।"

রুক্মিণী থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহার দাঁড়াইতে ইচ্ছা হইতেছিল না, অথচ গানটা শুনিবার লোভও সংবরণ করিতে পারিতেছিল না। তাহার অবস্থা দর্শনে মাণিক মৃদু হাসিয়া এসরাজটা সোজা করিয়া ধরিল এবং তাহাতে ছাড় ঘষিয়া গান ধরিল—

"বহু দূর হ'তে এসেছি বঁধু বারেক ফিরিয়ে—"

"ও রুণির মা ?"

আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গেই কৈলাসীর পিসী কৈলাসীর সহিত ঠিক দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই মাণিকের কাঁধ হইতে এসরাজটা তক্তাপোষের উপর পড়িয়া গেল।

১১

দত্তজা প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিলে ভজহরি বাজারের পয়সা চাহিল। প্রাতঃকালেই পয়সার তাগাদায় বিরক্ত হইয়া দত্তজা নির্ব্বোধ ভজহরির উপর গর্জ্জন করিতে করিতে কাপড় ছাড়িলেন, এবং হাতবাক্স খুলিয়া তাহার এ কুঠরী ও কুঠরীতে হাত বুলাইয়া সাতটী পয়সা বাহির করিলেন। সেই সাতটী পয়সাকে তিনি একবার দুইবার তিনবার গণিলেন; তারপর একটী পয়সা বাক্সে রাখিয়া বাকী পয়সা কয়টা ভজহরির দিকে ছুঁড়িয়া দিলেন। ভূপাতিত পয়সাগুলার দিকে তাচ্ছীল্যসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ভজহরি বলিল, "এই ছ'টী পয়সায় কি বাজার হবে শুনি!"

গম্ভীরভাবে দত্তজা বলিলেন, "সবই হবে। ধর, এক পোয়া আলু দেড় পয়সা, একপয়সায় এক পোয়া বেগুণ—"

ভজহরি বলিয়া উঠিল, "পাঁচ পয়সা সের বেগুণ; এক পয়সায় এক পোয়া বেগুণ দেবে কে ?"

দত্তজা বলিলেন, "দেবে হে দেবে; নিতে জানলেই দেয়। পাঁচ পয়সা সেরের বড় বড় বেগুণ না নিয়ে—"

"কাণা পোকা পচা নিতে হবে।"

"পয়সা দিয়ে কানা পোকাই নেবে কেন? বেছে নিতে পারলে ওরি মধ্যে ভাল জিনিষ পাওয়া যায়।"

মুখ ভার করিয়া ভজহরি বলিল, "চমৎকার জিনিষ পাওয়া যায়! তার পর কি বল।"

দত্তজা বলিলেন, "আর মাছ আধ পোয়া তু'পয়সা।"

ক্রুদ্ধভাবে ভজহরি বলিল, "হ্যাদে কত্তা, আমার বোনায়ের বাবা বাজারে আছে নাকি? ছ' আনা মাছের সের, আমি তু'পয়সায় আধ পো মাছ আনবো!"

দত্তজা বলিলেন, "তোরা বাজারে গেলেই জিনিষের দাম বেড়ে যায়। বেটারা সব নবাব পুত্তুর কি না।"

ভজহরি আপন মনে গোঁ গোঁ করিতে করিতে পয়সাগুলা কুড়াইতে লাগিল। দত্তজা আর একবার বাক্সের চারিপাশ হাতড়াইয়া একটা আধলা বাহির করিলেন, এবং বাক্স বন্ধ করিতে করিতে বলিলেন, "আজ খুচরো পয়সা বাড়ন্ত। ওরি মধ্যে যা হয় নিয়ে আয়। আর এই আধলাটা নিয়ে যা, পান আনিস। বাবুদের আবার ঠোঁটটী রাঙ্গা না হ'লে চলে না। বাবুয়ানি কত! ঝাঁটা মার বাবুয়ানির মাথায়।"

বলিয়া তিনি আধলাটা ভজহরির দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া রোষভরে মুখখানা বিকৃত করিলেন। ভজহরি পয়সা ও গামছা লইয়া

বাজারে চলিয়া গেল। দত্তজা এই নবাবপুত্রদিগের নবাবীর শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিতে করিতে স্নানের উদ্যোগে ব্যাপৃত হইলেন। এমন সময় মাণিক কোঁচার খুঁটটা কোমরে জড়াইয়া চটি জুতার ফট্ ফট্ শব্দ করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং দত্তজার দিকে চাহিয়া জোর গলায় জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি নাকি বিয়ের ঠিক করেছ দাদামশায় ?"

মুখ না তুলিয়াই পায়ের নখের কোণে তেল দিতে দিতে দত্তজা বলিলেন, "কার বিয়ে হে ? তোমার ?"

"তা নয় তো কি তোমার ? তুমি কি এই বুড়ো বয়সে আবার বিয়ে কত্তে যাবে ? লোকে যে গায়ে ধুলো দেবে।"

মৃদু হাসিয়া দত্তজা বলিলেন, "সেটা ঠিক। সেই ভয়েই তো চুপ করে আছি।"

মাণিক বলিল, "চুপ করে আছ কোথায় ? নিজে না পেরে অপরের ঘাড়ে চাপাচ্চো।"

"মানুষের ঐ একটা কেমন স্বভাব মাণিক চন্দর, নিজে যে অভাবের পূরণ কত্তে না পারে, সেটা অপরের দ্বারা পুরিয়ে নেবার চেষ্টা করে।"

বলিয়া তিনি মাণিকের মুখের উপর সহাস্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিয়ের ঠিক ক'রে এমন কিছু অন্যায় করেছি কি মাণিক চন্দর ?"

মাণিক স্বরটাকে খুব গম্ভীর করিয়া বলিল, "ন্যায় অন্যায় আমি বুঝি না, ওরা দেবে কি ?"

"মেয়ে।"

"আর ?"

"অর্দ্ধেক রাজত্ব।"

ভ্রূকুটী করিয়া মাণিক বলিল, "তা হ'লে টাকা কিছু দেবে না ?"

সহাস্যে দত্তজা বলিলেন, "টাকা দেবার ক্ষমতা থাকলে তোমার হাতে নিশ্চয়ই মেয়ে দিত না।"

মাণিকের মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, আমি কি ?"

দত্তজা বলিলেন, "তুমি রাজা তেজচন্দ্রের ত্যাজ্যপুত্র।"

ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে মাণিক বলিল, "সুদখোর কশাইএর ছেলে হ'লেই বুঝি ভাল হতো ?"

আহত শার্দ্দূলের ন্যায় রোষরক্ত দৃষ্টিতে দত্তজা মাণিকের মুখের দিকে চাহিলেন। দৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চোখ দুইটা যেন ঠিকরিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিল। মাণিক কিন্তু তাঁহার এই রোষকঠোর দৃষ্টিতে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমি যা হই, একটী হাজার টাকা না পেলে কিন্তু বিয়ে করবো না।"

দত্তজা আপনাকে সামলাইয়া লইয়া মুখ ফিরাইয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "বেশ।"

মাণিক আর কিছু না বলিয়া বাহিরের ঘরে ঢুকিল, এবং হার্ম্মোনিয়ম লইয়া বাজাইতে লাগিল। দত্তজা কতক্ষণ স্তব্ধভাবে

বসিয়া রহিলেন, তারপর গামছাখানা কাঁধে ফেলিয়া স্নান করিতে গেলেন।

সেই দিন সন্ধ্যার পর দত্তজা কথায় কথায় মাণিকের নিকট হইতে জানিয়া লইলেন, মাণিকের বিবাহে অসম্মতির মূলে দাশু ঘোষের কুমন্ত্রণা রহিয়াছে। সে মাণিককে বলিয়াছে যে, তাহার বিবাহের ভাবনা কি; সে এখনই সুন্দরী সুরূপা মেয়ের সহিত মাণিককে নগদ দুই হাজার টাকা পাওয়াইয়া দিতে পারে।

দত্তজা তখন মাণিককে বুঝাইয়া দিলেন যে, দাশু ঘোষের কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। রমানাথের সহিত তাহার শত্রুতা আছে, এজন্য উহার মেয়ের বিবাহে বাধা দেওয়াই তাহার মূল উদ্দেশ্য। বিবাহে টাকা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এল-এ, বি-এ পাশ না হইলে হাজার দরে টাকা পাওয়া যাইতে পারে না। দুই এক শত পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেজন্য মাণিকের চিন্তা কি, তিনি ইহার দ্বিগুণ পোষাইয়া দিবেন।

এইরূপে মাণিককে বুঝাইয়া দত্তজা বাঁয়া তবলা কিনিবার জন্য তাহাকে সাতটা টাকা ফেলিয়া দিলেন।

মাণিক আপনার রূঢ় ব্যবহারের জন্য দাদা মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

দত্তজা মাণিককে শান্ত করিয়া কুপরামর্শদাতা দাশু ঘোষকে কি উপায়ে জব্দ করা যায় ইহা অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়া ভাবিলেন। উপায় অনেক ছিল। একবার তাহার নামে এক শত তিরিশ টাকার ডিক্রি হইয়াছিল। তাহার মধ্যে এক শত

টাকা মাত্র আদায় হইয়াছিল। এক্ষণে বাকী টাকাটার জন্য ডিক্রি জারি করিয়া অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিলে মন্দ হয় না। দত্তজা হিসাব করিয়া দেখিলেন, ডিক্রীর তিন বৎসর মেয়াদ এখনও অতীত হয় নাই। সেই পুরাতন ডিক্রীটা নূতন করিয়া জারি করিলে দাশুকে বেশ শিক্ষা দেওয়া যায়। কিন্তু হাঙ্গামা অনেক। দূর হউক, শমন আসিয়া নিজের উপর ডিক্রীজারি করিতে উদ্যত হইয়াছে, এ সময়ে পরের উপর ডিক্রীজারি আর ভাল লাগে না।

উহার মেয়েটাকে লইয়া পাড়ায় পাড়ায় নানা কথা রটিয়াছে; সেই কথাগুলার উপর জোর দিয়া একটা আন্দোলন তুলিলে হয়। কিন্তু তাহাতে দাশু অপেক্ষা মেয়েটাই অধিক জব্দ হইবে। সুতরাং দত্তজা সে উপায়ও ত্যাগ করিলেন।

তারপর ক্রমে ক্রমে তিনবার মালা ফিরাইয়াও দত্তজা যখন কোনও উপায় স্থির করিতে পারিলেন না, তখন নিতান্ত বিরক্ত-চিত্তে মালা রাখিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

১২

সেদিন সকাল সকাল স্নান শেষ করিয়া দত্তজা সবেমাত্র আহ্নিকে বসিয়াছেন, এমন সময় মাণিক কাপড় জামা পরিয়া উপস্থিত হইল, এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় দিতে দিতে বলিল, "চললাম দাদামশায়।"

কথাটা এমনই আকস্মিকভাবে শ্রুত হইল যে, দত্তজা তাহার মর্ম্ম বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না; তিনি বিস্ময়বিমূঢ়ভাবে

হাঁ করিয়া মাণিকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মাণিক কিন্তু তাঁহাকে বুঝিয়া লইবার অবসর না দিয়াই ঘরের বাহিরে আসিল, এবং জুতার ফিতা বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, "কিছু মনে ক'রো না দাদামশায়, তোমার উপর অনেক উৎপাত উপদ্রব করেছি। যদি সময় পাই তো আবার আসবো।"

কষ্টে বিস্ময় দমন করিয়া দত্তজা রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাবে?"

মাণিক সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উত্তর করিল, "ঠিক নাই। শুনেছি, যাদব অধিকারীর দল রাজহাটীতে এসেছে। আজ তো সেইখানেই যাচ্চি।"

বলিয়া মাণিক দত্তজাকে জিজ্ঞাসার অবসর না দিয়াই উঠানে নামিয়া পড়িল, এবং আপন মনে দুর্গা দুর্গা বলিয়া বাহির হইয়া গেল। দত্তজার বিস্ময়স্তব্ধ কণ্ঠ হইতে যেন আপনা হইতেই উচ্চারিত হইল, দুর্গা দুর্গা। তারপর মাণিক দৃষ্টির অতীত হইয়া গেলে দুর্গা নাম উচ্চারণ জন্য তিনি নিজের কাছেই যেন অতিমাত্র লজ্জিত হইয়া পড়িলেন, এবং আহ্নিকের উপকরণগুলা সম্মুখে লইয়া হতবুদ্ধির মত বসিয়া রহিলেন। সেগুলার যে সদ্ব্যবহার করিতে হইবে সে কথা মনে আসিল না।

যখন মনে আসিল, তখন সূর্য্য মাথার উপর উঠিয়াছে, চড়া রোদ আসিয়া দরজার চৌকাঠের পাশে উঁকি দিতেছে। দত্তজা তাড়াতাড়ি ফিরিয়া বসিলেন, এবং আচমন করিয়া আহ্নিকে প্রবৃত্ত হইলেন।

ভজহরি মাঠ হইতে ফিরিয়া ঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "হ্যাদে কত্তা, দুকুর গড়িয়ে যায়, এখনো মালা ঠক্‌ঠক্‌ কত্তে নেগেচো। আজ কি খেতে হবে না?"

তাহার দিকে একটা কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই দত্তজা পুনরায় জপে মনোনিবেশ করিলেন।

খানিক পরে দত্তজা জপ শেষ করিয়া উঠিলে ভজহরি যেন বিরক্তির সহিত শ্লেষপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কোথায় নেমন্তন্ন আছে নাকি কত্তা?"

মুখ খিঁচাইয়া দত্তজা রোষতীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "যমের বাড়ী নেমন্তন্ন আছে, যাবি?"

মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে ভজহরি বলিল, "তা হ'লে তো বেঁচে যাই কত্তা। এই ভোর দুকুর গাধার খাটুনি খেটে এসে তোমার দাঁতঝাড়া খেতে হয় না।"

ক্রোধগম্ভীর স্বরে দত্তজা বলিলেন, "তা বৈকি রে ভজা, আমার কি কম অপরাধ? পূজো আহ্নিক সব ফেলে সাত সকালে তোমাদের রেঁধে না দিলে চলবে কেন। আমার কি ধর্ম্ম কর্ম্ম পরকাল কিছু আছে? তোমরা সব আমার পরকালে সাক্ষী দেবে কি না। ঝাঁটা মারি এমন সব সাক্ষীর মাথায়।"

মুখ ভার করিয়া ভজহরি বলিল, "ঝাঁটাই মার আর লাথিই মার, পেটের দায়ে যখন পড়ে আছি, তখন সব সইতে হবে। পোড়া পেটের দায় বিষম দায় কত্তা।"

"আচ্ছা আচ্ছা, তোমার পেটের বহর কত বড় দেখছি"

বলিয়া দত্তজা জোরে জোরে পা ফেলিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলেন। হাঁড়ীতে কতকগুলা বাসী ভাত ছিল, সেগুলা বাড়িয়া ভজহরিকে ধরিয়া দিলেন। খাইতে বসিয়া ভজহরি জিজ্ঞাসা করিল, "আমার তো যা হয় হ'লো, তোমাদের হবে কখন্?"

বিরক্তভাবে দত্তজা বলিলেন, "যখন হোক হবে।"

"তোমার সুদের সুদ খাবে কি?"

"ছাই।"

"ছাই যদি খাবার হ'তো কর্ত্তা, তা হ'লে এদ্দিনে তোমার আর একটা সিন্দুক ভরে উঠতো।"

দত্তজা তাহার দিকে কঠোর দৃষ্টিপাত করিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন, এবং ঘরের দাবায় মাদুর পাতিয়া খাতা পত্রের দপ্তর লইয়া বসিলেন। কিন্তু এ সময়ে সুদের হিসাব ভাল লাগিল না; খাতা রাখিয়া পাঁজির পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। প্রথমে বিবাহের কতকগুলা দিন দেখিলেন, তারপর যাত্রার শুভদিন, শিবজ্ঞান মতে মহেন্দ্র যোগ, অমৃত যোগ দেখিলেন, সিংহ রাশির দ্বাদশ মাসের ফলাফল দেখিলেন, বৈশাখ মাসে স্ত্রীলাভ ফল পড়িয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। তারপর পাঁজি রাখিয়া একখানা অর্দ্ধছিন্ন রামায়ণ বাহির করিলেন। রামায়ণখানা শুধু ছেঁড়া ছিল না, মাঝে মাঝে তাহার পাতার উপরে নীচে নিজের সরু মোটা অনেক রকম হস্তাক্ষর ছিল। কোথাও দুর্গানাম, কোথাও চিন্তামণি পালের সুদের হিসাব, কোথাও বাজার খরচ লেখা ছিল। এই সকল লেখা পড়িয়া পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে এক

একস্থানে চোখ বুলাইতে লাগিলেন। অন্ধক মুনির শাপ পড়িলেন, রামের বনগমন পড়িলেন, সীতাহরণ কতকটা পড়িয়া বই বন্ধ করিলেন। ভজহরি আহার শেষ করিয়া তামাক সাজিয়া দিল। দত্তজা নীরবে হুঁকায় টান দিতে লাগিলেন।

ভজহরি জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কি সত্যি রাঁধবে না কত্তা?"

গম্ভীর ভাবে দত্তজা উত্তর দিলেন, "না।"

ভজহরি একটু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "অবাক্ করলে কত্তা, না রাঁধলে খাবে কি? তোমার সুদের সুদই বা কি খাবে?"

নাসা কুঞ্চিত করিয়া দত্তজা বলিলেন, "সে আপদ চুকে গিয়েছে। সে নিজের পথ দেখেছে।"

ভজহরি কথাটা বেশ বুঝিতে না পারিয়া হাঁ করিয়া দত্তজার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার এই অজ্ঞতায় যেন বিরক্ত হইয়া দত্তজা বলিলেন, "বুঝতে পাচ্ছিস্ না? সে চলে গিয়েছে।"

আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে ভজহরি বলিল, "চলে গেল?"

ক্রুদ্ধস্বরে দত্তজা বলিলেন, "হাঁ, চলে গেল। যাবে না তো বারো মাস এইখানে থাকবে? কেন, আমার কি ভাত রাখবার জায়গা নাই।"

মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে করিতে ভজহরি বলিল, "তাই তো, চলে গেল!"

মুখের কাছ হইতে হুঁকাটা সরাইয়া গর্জ্জন করিয়া দত্তজা বলিলেন, "গেলেই বা? আপদ্ গিয়েছে না বেঁচেছি। তুই বলিস্ কি রে ভজা, আমাকে যেন উদ্বাস্ত করে তুলেছিল। আজ হার্ম্মোনিয়ম কিনতে হবে, আজ ফিষ্টির পয়সা চাই, আজ জামা চাই, আজ জুতো চাই, আজ বাঁয়া তবলা কিনবো। যেন নবাব-পুত্তুর। এই এক মাসে আমার সাত হাল করে দিয়েছে।"

দাবার একপাশে গামছা পাতিয়া শয়নের উদ্যোগ করিতে করিতে ভজহরি জিজ্ঞাসা করিল, "গেল কোথায়?"

তাচ্ছীল্যসূচক স্বরে দত্তজা বলিলেন, "চুলোয়। যাক্ না, গিয়ে দেখুক না, এমন আবদার কোথায় চলে।"

ভজহরি শয়ন করিয়া আলস্য ভাঙ্গিয়া বলিল, "কোথাও চলবে না কত্তা, কোথাও চলবে না। পরের তরে এতটা করবে কে? বলে—কোথাকার কে—"

খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া দত্তজা বলিলেন, "ঠিক বলেছিস্ ভজা, কোথাকার কে, মাসীর মায়ের বকুল ফুলের নাতজামাই। তাঁর আবার নবাবী কত! গেরো রে ভজা, গেরো!"

হুঁকাটা পাশে রাখিয়া দত্তজা খাতা লইয়া ব্যস্ত হইলেন এবং মধ্যে মধ্যে একটা বাজে কাগজে হিসাব লিখিতে লাগিলেন। ভজহরি ঘুমাইয়া পড়িল, তাহার নাসিকার গর্জ্জনে নিদ্রার গাঢ়ত্ব প্রতিপন্ন করিয়া দিতে লাগিল।

ক্রমে ভজহরির নাসিকাধ্বনি এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, দত্তজা বিরক্ত হইয়া ডাকিলেন, "ভজা, ওরে ভজা!"

ভজহরি চমকিত ভাবে চক্ষু উন্মীলিত করিল এবং উঠিয়া বসিয়া একবার মাথাটা নাড়িয়া আপনাকে সজাগ করিয়া লইল। তার পর দুই হাতে নিদ্রালস চোখ দুইটা মুছিতে মুছিতে বলিল, "হ্যাদে কত্তা, তোমার রকম কি? এখনো সেই বই দপ্তর নিয়ে হিজি বিজি কাটচো?"

দত্তজা বলিলেন, "আমি তো হিজি বিজি কাটচি, আর তুই বেটা যে দিন দুপুরে ষাঁড়ের মত নাক ডাকিয়েছিলি।"

অপ্রতিভভাবে ভজহরি বলিল, "এমন কথা কয়ো না কত্তা! ঘুমুলে অনেক লোকের নাক ডাকে বটে, আমার কিন্তু মোটেই নাক ডাকে না।"

ঈষৎ হাসিয়া দত্তজা বলিলেন, "এই যে ডাকছিল।"

বিরক্তির সহিত মাথা নাড়িয়া ভজহরি বলিল, "তুমি বললেই হবে। এক এক দিন তোমার নাক ডাকে, তুমি ঘরের ভেতর থাক, আমি বাইরে থেকে শুনতে পাই। আর আমার নিজের নাক ডাকলে আমি শুনতে পাব না?"

সহাস্যে দত্তজা বলিলেন, "সেটা ঠিক কথা বটে, আমারি তা হলে শুন্‌তে ভুল হ'য়েছে।"

ভজহরি দাঁড়াইয়া গামছাখানা ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল, "আজ কাল তোমার এমনি ভোলা মন হয়েছে বটে কত্তা, এই বল এই মনে থাকে না। সেদিন বললে, ওরে ভজা, তোকে একখানা ভালো কাপড় কিনে দেব। সে আজ মাস পেরুতে চললো, কাপড়ের নামটীও কর না।"

দত্তজা রুক্ষস্বরে বলিলেন, "নাম করবো আবার কি। দিবা রাত্র কাপড় কাপড় করে চীৎকার কত্তে হবে নাকি? কাপড় তো মুফৎ আসবে না বাপু, পয়সা চাই। নগদ আঠার গণ্ডা পয়সা হ'লে তবে একখানি কাপড় আসবে। এ মাসে দেখছিস, পাঁচটা টাকা সুদ আদায় হ'য়েছে? অথচ এক হতভাগার বেটা এসে কতকগুলো টাকা খরচ করিয়ে দিলে।"

বলিয়া দত্তজা মুখখানাকে বিকৃত করিলেন। ভজহরি গামছা খানা এ কাঁধ হইতে ও কাঁধে ফেলিয়া ভারি মুখে প্রস্থানোদ্যত হইল। দত্তজা তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "চললে যে গো বাবু, একটু তামাক দিয়ে যাও না।"

ভজহরি ফিরিয়া হুঁকার মাথা হইতে কলকা খুলিতে খুলিতে বলিল, "আজ কি তামাক খেয়েই দিন কাটাবে কত্তা?"

গম্ভীর ভাবে দত্তজা বলিলেন, "দিন আমার কেটে গেছে ভজা, এখন বাকী এই চিক্‌চিকে রোদটুকু, তা ওটুকু তামাক খেতে খেতেই কেটে যাবে।"

বলিয়া তিনি একটু ম্লান হাসি হাসিলেন। ভজহরি কলিকার গুল ঝাড়িয়া তাহাতে তামাক ভরিতে ভরিতে বলিল, "তোমার সবটাই বাড়াবাড়ি কত্তা। পরের ছেলেটা চলে গেছে ব'লে রাঁধবে না, খাবে না।"

মুখ খিঁচাইয়া দত্তজা বলিলেন, "তোকে বলেছে খাব না, উপোস দিয়ে থাকবো। শরীরটা ভাল ছিল না, তাই এ বেলা লঙ্ঘন দিলাম। এই দেখ্ না, সন্ধ্যার পর রান্না চড়িয়ে দিব্যি

মাছের ঝোল ভাত তৈরি করি। তুই জালখানা নিয়ে একবার দেখ দেখি, যদি কিছু হয়।"

উৎসাহের সহিত ভজহরি বলিয়া উঠিল, "পালেদের দরুণ পুকুরটায় দেখবো কত্তা? বড্ড মাছ হয়েছে। যে রকম ঘাই দেয়।"

দত্তজা তাড়াতাড়ি বলিলেন, "না না, ও পুকুরের মাছ থাক। ভুলো জেলে ওর মাছ নেবার তরে লুফিয়ে আছে। সেদিন উনিশ টাকা দর দিয়েছিল, আমি কুড়ি টাকা বলেছি! শেষে সাড়ে উনিশ পর্য্যন্ত উঠেছে। আমি কিন্তু কুড়ির এক পয়সা কমে ছাড়বো না। দু'মণ মাছ যদি হয়, রোক চারখানি নোট। তার ভাঙাভর্ত্তি হ'লে চলবে না। তুই পালেদের খিড়কীতে দেখ না। ওটাতেও খুব মাছ জন্মেছে। সেদিন তাগাদায় গিয়ে দেখলাম, ঘাটের ধারে মাছগুলো এসে ঘাই দিচ্চে।"

ভজহরি একটু ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "তা বটে কত্তা, কিন্তু দেখতে পেলে বড্ড খ্যাচ খ্যাচ করে।"

তর্জ্জন করিয়া দত্তজা বলিলেন, "এ্যাঃ, খ্যাচ খ্যাচ করে! আজ চার মাস সুদের একটি পয়সা দেয় নি তা জানিস্। তুই যা দেখি, যদি কিছু বলে, বেটার পুকুর ভিটে সব বেচে নেব না।"

বলিয়া দত্তজা খাতার উপরে জোরে একটা চাপড় মারিলেন। ভজহরি নীরবে কলিকায় ফুঁ দিতে লাগিল।

এমন সময় বাহিরের ঘর হইতে হার্ম্মোনিয়মের শব্দ উত্থিত

হইতেই দত্তজা চমকিয়া উঠিলেন, এবং "ঐ রে, মাণিক এয়েচে" বলিয়া তড়াক্ করিয়া উঠিয়া বাহিরের ঘরের দিকে ছুটিয়া গেলেন; দরজার কাছে গিয়া হর্ষবিজড়িত কণ্ঠে ডাকিলেন, "মাণিক!"

কিন্তু কোথায় মাণিক? কৈলাসীর খল্ খল্ হাস্যধ্বনিতে ঘর ভরিয়া উঠিল। দত্তজা দুই হাতে দরজা চাপিয়া ধরিয়া মুহ্যমান ভাবে দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

১৩

কৈলাসী ডাকিল, "দাদামশায়!"

দত্তজা হতাশ-বিবর্ণ দৃষ্টিটা তুলিয়া তাহার মুখের উপর স্থাপন করিলেন। কৈলাসী জিজ্ঞাসা করিল, "অমন ক'রে দাঁড়িয়ে পড়লে যে?"

দত্তজা আপনার বিহ্বল ভাবটা কতক সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, "তুই বাজাচ্চিস্? আমি মনে ক'রেছিলাম বুঝি মাণিক ফিরে এসেছে।"

বলিয়া তিনি দরজা ছাড়িয়া ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। কৈলাসী হার্মোনিয়ম ছাড়িয়া তাঁহার শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দত্তজা তক্তাপোষের উপর থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া ভাঙ্গা গলায় বলিলেন, "সে চলে গিয়েছে কৈলাসী।"

কৈলাসী যেন একটু ব্যস্ত ভাবেই জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় গেল?"

ললাট কুঞ্চিত করিয়া দত্তজা বলিলেন, "কে জানে, কোন্

চুলোয় গেল। যাবার ঠাঁই বা আছে কোথায়? মোদ্দা চলে গিয়েছে।”

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাসে দত্তজার বুকটা যেন কাঁপিয়া উঠিল। তিনি সেটাকে জোরে চাপিয়া কৈলাসীর দৃষ্টির সম্মুখ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। কৈলাসী বসিয়া নীরবে হার্ম্মোনিয়মের ডালার উপর আঙ্গুল ঘষিতে লাগিল।

দত্তজা সহসা মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,“আচ্ছা কৈলাসী?”

“কেন দাদামশায়?”

“সে কেন গেল বলতে পারিস্?”

উত্তরের আশায় দত্তজা আগ্রহের সহিত কৈলাসীর মুখের দিকে চাহিলেন। কৈলাসী কিন্তু উত্তর দিল না; সে যেমন নতমুখে বসিয়াছিল, সেই ভাবেই বসিয়া রহিল। দত্তজা উত্তরের জন্য ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোর কি মনে হয়? বিয়ে কত্তে তার মত ছিল না?”

“কি জানি।”

“অমতই বা হবে কেন? তোকে পছন্দ হয় নি?”

“হতে পারে।

গর্জ্জন করিয়া দত্তজা বলিলেন, “কক্ষনো হতে পারে না। কেন, তোর চেহারা এমন কি মন্দ যে, পছন্দ হবে না?”

উত্তরে কৈলাসী মৃদু হাসিল। দত্তজা বলিলেন, “আর তোর চাইতে সুন্দরীই বা সে পাবে কোথায়? ন মাতা ন পিতা ন বন্ধু, যাকে অগ্নিদগ্ধা বলে ঠিক তাই। গুণও তো কত? ক অক্ষর

গোমাংস, শুধু যাত্রা নাচ গান নিয়ে হৈ হৈ ক'রে ঘুরে বেড়ায়; তাকে আবার মেয়ে দেবে কে? রমা মেয়ে দিচ্ছিল শুধু আমার উপরোধে। কেমন ঠিক কি না?"

কৈলাসী মাথাটা আরও নীচু করিয়া খুব জোরে জোরে হার্মোনিয়মের ডালায় আঙ্গুল ঘষিতে লাগিল। দত্তজা উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "পষ্ট কথা বলবো, তা বাপ কেন্নে হোক না। রমা মেয়ে দিচ্ছিল শুধু আমাকে দেখে। তা বাবুর পছন্দ হ'লো না। না হ'লো নাই হ'লো, রমার মেয়ের কি বিয়ে হবে না! উঃ, বাবু কি সুপাত্তর! সে দিন আমাকে জিগোস কচ্ছিল, কত টাকা দেবে? আমি বললাম, দেবে আবার কি, এক পয়সাও দিতে পারবে না, বড় জোর না হয় ঘরখরচটা দেবে। তাতেই বাবুর বোধ হয় রাগ হয়েছে। ওঃ, রাগ হয়ে থাকে ঘরের ভাত বেশী ক'রে খাবে। তাও তো শুণ্যি; ঘর নাই তার ঘরের ভাত।"

দত্তজা আপনা মনে হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কৈলাসীও তাঁহার কথায় একটু না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। দত্তজা আপন মনে কিছুক্ষণ হাসিয়া কৈলাসীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কেমন, আমি ঠিক ধরেছি কি না? টাকা পাবে না শুনেই বাবু রেগে চলে গেলেন। ভেবেছে, সে ছাড়া দেশে আর পাত্তর নাই, সে চলে গেলে রমার মেয়ের বিয়ে হবে না। কিন্তু আমিও গোবিন্দ দত্ত, আমিও দেখাবো এই ক'দিনের মধ্যে বিয়ে দিতে পারি কি না।"

বলিয়া তিনি তক্তাপোষের উপর এমন জোরে একটা চাপড় মারিলেন যে, কৈলাসী তাহাতে চমকিয়া উঠিল। মাণিকের এই আকস্মিক পলায়ন ব্যাপারে কৈলাসীও যে আশ্চর্য্যান্বিত না হইল এমন নহে, কিন্তু হঠাৎ পূর্ব্বদিনের বৃত্তান্তটা—রুক্মিণীর সহিত মাণিকের নিভৃত আলাপটা মনে পড়িতেই এই পলায়ন ব্যাপার কৈলাসীর নিকট বেশ সোজা হইয়া আসিল।

মাণিক যে কেন পলাইয়াছে, পলায়ন ছাড়া কৈলাসীর নিকট দুর্ব্বিষহ লজ্জা হইতে পরিত্রাণ পাইবার তাহার আর কোন উপায়ই যে ছিল না ইহা জানিলেও কৈলাসী সে কথাটা স্পষ্ট বলিয়া দাদামশায়ের ভ্রান্ত ধারণাকে দূর করিয়া দিতে পারিল না; কথাটা ঠোঁটের আগায় আসিলেও সে জোর করিয়া তাহাকে চাপিবার জন্য আপনার জিভটাকে দাঁত দিয়া চাপিয়া রহিল। দত্তজা কিন্তু তাহার মনোভাব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি নীরবে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তবে এই ক'টা দিনের ভিতর হ'য়ে ওঠে কি না সন্দেহ। মোটে পাঁচটা দিন। তা মাসের ভিতর আরও তো দিন আছে। তবে এই দিনেই হ'তে পারে, যদি তোর মত হয়।"

বলিয়া তিনি কৈলাসীর মুখের উপর হাস্যোজ্জ্বল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। কৈলাসী একটু লজ্জিত, একটু কৌতূহলান্বিত ভাবে মুখ তুলিয়া চাহিল। দত্তজা বলিলেন, "আমাকে পছন্দ হয়?"

মাথা নাড়িয়া কৈলাসী সহাস্যে উত্তর দিল, "খু-উ-ব।"

ঈষৎ হাসিয়া দত্তজা বলিলেন, "দূর পাগলি, আমি যে বুড়ো।"

কৈলাসীও সহাস্যে উত্তর করিল, "হ'লেই বা বুড়ো। বুড়ো কি মানুষ নয়?"

"মানুষ বটে, কিন্তু বুড়োমানুষ। বুড়ো মানুষের সংসারে আর যে সকল কাজেই অধিকার থাক, বিয়েতে তার মোটেই অধিকার নাই।"

"আমি তোমাকে সে অধিকার দিচ্চি দাদামশায়।"

ম্লান হাসি হাসিয়া দত্তজা বলিলেন, "তুই অধিকার দিলে কি হবে কৈলাসী, ভাঙ্গা হাটে বেসাতি আর জমবে কেন? শেষ বেলার চিকচিকে রোদটুকুকে সকালের আলো ব'লে মনকে প্রবোধ দিলেও সে আলোটুকু কতক্ষণ থাকবে কৈলাসী? হাজার চেষ্টা করলেও সে সকাল, সে দুকুর বেলা আর ফিরে আসবে না! চোখ না পাল্টাতেই রাত্রির অন্ধকার এসে যে ঘিরে ফেলবে!"

আসন্ন অন্ধকারের সম্ভাবনায় দত্তজার মুখখানাও যেন অন্ধকারে মলিন হইয়া আসিল। তাঁহার ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া কৈলাসী মৃদু কোমল কণ্ঠে বলিল, "তোমার মুখ খানা আজ বড্ড শুকনো দেখাচ্চে দাদামশায়। আজ কি খাওয়া হয় নি?"

ত্রস্তে মুখ ফিরাইয়া লইয়া দত্তজা বলিলেন, "খাওয়া? খাওয়া হয় নি বটে।"

"কেন হয় নি দাদামশায়?"

"রাঁধতে ভাল লাগলো না। রোজ দু'বেলা রাঁধা খাওয়া, ভাল লাগে কি ?"

"তাই এত দিন পরে আজ রান্না খাওয়া দু'টোই বন্ধ দিয়েছ বুঝি ?"

বলিয়া কৈলাসী মৃদু হাসিল। তাহার সেই মৃদু হাসিটুকুর মধ্যে শ্লেষের তীব্রতা লক্ষ্য করিয়া দত্তজা ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। কৈলাসী সহাস্যে বলিল, "চোরের উপর রাগ ক'রে মাটীতে ভাত খেলে নিজের কি লাভ হয় দাদামশায় ?"

"বোকামি।"

"তোমাকে আমি কক্ষনো সে অপবাদ দিতে পারবো না। তোমার দু'বেলা রান্না ভাল না লাগে, আমি না হয় গা হাত ধুয়ে এসে এবেলা সে কাজটা চালিয়ে দিচ্ছি।"

কৈলাসী উঠিয়া দাঁড়াইল এবং দত্তজা নত মুখ উত্তোলন করিবার পূর্ব্বেই দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। দত্তজা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তারপর আস্তে আস্তে উঠিয়া বাড়ীর বাহিরে বকুল গাছটার তলায় গিয়া বসিলেন। অপরাহ্নের ম্লান আলোকে আকাশটা তখনও উজ্জ্বল ছিল; এক এক টুকরা সাদা মেঘ নীল আকাশের এদিকে সেদিকে ভাসিয়া বেড়াইতে-ছিল; মৃদু বাতাস কাণের পাশ দিয়া আস্তে আস্তে বহিয়া যাইতেছিল। দত্তজা দিবার শেষ আলোকে মণ্ডিত আকাশ-প্রান্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিলেন। বসিয়া থাকিতে থাকিতে একটা গান মনে পড়িল। গানটা মাণিক প্রায়ই গাহিত।

গানের সুরটা মনে না থাকিলেও কথাগুলা মনে ছিল। দত্তজা মনে মনে সেই কথাগুলার আবৃত্তি করিতে লাগিলেন ;

"যেতে হবে আর দেরী নাই।
আয়রে ভবের খেলা সেরে,
আঁধার ক'রে আসচে যে রে
পিছন ফিরে বারে বারে,
কাহার পানে চাহিস্ রে ভাই।"

পিছনে কে আছে ? কেহই নাই। সম্মুখে যেমন অন্ধকার, পিছনেও তেমনি। এই অন্ধকারের মধ্যে কাহাকে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছি ? কাহার জন্য এখনও পড়িয়া পড়িয়া সংসারের এই কঠোর আঘাত সহ্য করিতেছি ? একি মোহ ! একি ভ্রান্তি ! বিশ্বনাথ ! এই মোহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া দাও, এই ভ্রান্তি দূর করিয়া দাও। অধম আমি, পাপী আমি, তোমার চরণাশ্রয় দিয়া আমাকে কৃতার্থ কর দয়াময় !

দত্তজার বুকটা থাকিয়া থাকিয়া যেন কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল ; সায়াহ্নের ম্লান আলোকে অতীতের চিত্রগুলা মনের ভিতর একে একে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল ! বাল্য, কৈশোর, যৌবন, স্ত্রী পুত্র কন্যা, স্নেহ ভক্তি ভালবাসা, সব যেন স্বপ্নের ছবির মত চোখের উপর দিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া চলিল। দত্তজার বক্ষঃস্পন্দন যেন রুদ্ধ, দৃষ্টি ঝাপ্সা হইয়া আসিল। আপনার এই দুর্ব্বলতায় আপনি লজ্জিত হইয়া তিনি তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

এমন সময় রমানাথ আসিয়া ডাকিল, "খুড়ো!"

দত্তজা ঝাপ্সা চোখে তাহার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া পুনরায় বসিয়া পড়িলেন।

রমানাথ জিজ্ঞাসা করিল, "মাণিক কি চলে গেল খুড়ো?"

ঔদাস্যসূচক স্বরে দত্তজা উত্তর করিলেন, "গেল বৈ কি।"

"তাই তো" বলিয়া রমানাথ একটা নিশ্বাস ফেলিল।

দত্তজা মুখখানা বিকৃত করিয়া ঈষৎ রোষগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "যে চলে যাবে তাকে কি ধ'রে রাখবো? আমার কি গলায় দড়ি জোটে না?"

রমানাথ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "চলেই বা গেল কেন? ছোঁড়া তো দিব্যি সুখে ছিল।"

গভীর আক্ষেপের সুরে দত্তজা বলিলেন, "হতভাগা, বুঝলে রমানাথ, একেবারে হতভাগা। হতভাগা লোক কি কখন সুখে থাকতে পারে? তাদের সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়। দূর ক্ষোক, তুমি আবার এই হতভাগাকে মেয়ে দিতে চেয়েছিলে।"

যেন তীব্র ঘৃণায় দত্তজা ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত করিলেন। মাণিককে কন্যাদানে উদ্যত হইয়া রমানাথ নিজে কতটা দোষ করিয়াছিল, আর খুড়াই বা সে বিষয়ে কতটা দোষী ইহা স্থির করিতে না পারিয়া রমানাথ নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। দত্তজা নিজেই কিন্তু ইহার মীমাংসা করিয়া দিয়া বলিলেন, "দোষ তোমার একার নয়, আমিও তো তোমার মতে মত দিয়েছিলাম। তবে আমি ভেবেছিলাম কি জান—"

দত্তজা হঠাৎ থামিয়া গেলেন, এবং একটু ভাবিয়া আপন মনে হাসিয়া বলিতে লাগিলেন, "মানুষের আশার শেষ নাই রমানাথ, সকলের শেষ আছে, কিন্তু আশার শেষ কিছুতেই নাই। এই পঞ্চাশ বছরে কত যে ভেবেছি, আর সেই ভাবনার পরিণাম কি দাঁড়িয়েছে, তা মনে করলে এখন হাসি আসে। তবু ভেবে ছিলাম কি জান, ছোঁড়াটা যদি স্থায়ী হয়, আর কিছু না হোক, ভিটেটাতেও তো সন্ধ্যা পাবে। তা আমি ভাবলে কি হবে, তার কপাল।"

ক্ষোভে দত্তজার স্বরটা যেন গাঢ় হইয়া আসিল। তিনি মুখ ফিরাইয়া লইয়া অন্যমনস্কভাবে মাথার চুলগুলা টানিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার কৃষ্ণছায়ায় আকাশের উজ্জ্বল নীলিমা ম্লান হইয়া আসিল। সম্মুখের রাস্তা দিয়া একখানা গরুর গাড়ী খটর্ খটর্ শব্দ করিতে করিতে চলিয়া গেল। গৃহাভিমুখী কৃষক মাথায় গামছা বাঁধিয়া গলা ছাড়িয়া গাহিতে গাহিতে চলিয়াছিল—

"দিন ফুরালো সন্ধ্যে হ'লো
পার করো আমারে।"

রমানাথ জিজ্ঞাসা করিল, "তা হ'লে কৈলাসীর কি করি খুড়ো?"

মুখ ফিরাইয়া আনিয়া রুক্ষকণ্ঠে দত্তজা বলিলেন, "যা ভাল বুঝবে তাই করবে, আর কি বলবো। আমি আর কারো কোন কথাতেই নাই বাপু।"

অন্ধকার আকাশপ্রান্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, দত্তজা ভ্রুকুঞ্চন

সহকারে বলিলেন, "আমার আর পরের ভাবনা ভাববার ইচ্ছা নাই। ভেবেই বা হবে কি? ততক্ষণ নিজের পরকালের ভাবনা ভাবলে অনেক কাজ হবে।"

রমানাথ ম্লান মুখে নীরবে বসিয়া রহিল। দত্তজা একটু তীব্রস্বরে বলিলেন, "দেশে হাজার হাজার ছেলে আছে, খুঁজে দেখ। কিছু টাকার যোগাড় কর। তা হলেই মেয়ে পার হবে।"

দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রমানাথ বলিল, "তা হয় খুড়ো। এই যে রঞ্জিতপুরেই একটী ছেলে আছে। কিন্তু চার শো খান টাকা চাই।"

কঠোর স্বরে দত্তজা বলিলেন, "আসল কথা ঐ, টাকা চাই, আর সেইজন্যই খুড়োর কাছে পরামর্শ নিতে এসেছ। কিন্তু একটী পয়সার প্রত্যাশা আমার কাছে আর ক'রো না বাপু। আমি এবার সত্যিই হিসাব নিকাশ শেষ ক'রে মাসখানেকের মধ্যেই চলে যাচ্চি।"

বলিয়া দত্তজা উঠিবার উপক্রম করিলেন। রমানাথ তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল, "আচ্ছা খুড়ো!"

দত্তজা পুনরায় বসিলেন। রমানাথ বলিল, "তোমার কি এর মধ্যে কাশীবাসের সময় হ'য়েছে?"

মেঘাচ্ছন্ন অপরাহ্নের উপর ম্লান সূর্য্যকিরণের চমকের মত দত্তজা একটু হাসিয়া বলিলেন, "অসময় যে তাই বা কে বললে?"

রমা। তোমার মত বয়সে কত লোক আবার নূতন সংসার পেতে বসে।

দত্ত। সেটা ভাঙ্গা ঘরে গোঁজা দেয়।

জোরে মাথা নাড়িয়া রমানাথ বলিল, "সে যাই হোক খুড়ো, তোমাকে আবার সংসার পাততেই হবে।"

দত্তজা বিস্ময়ান্বিতভাবে রমানাথের মুখের দিকে চাহিলেন। রমানাথ বলিল, "আমার সঙ্গতিও নাই, শক্তিও নাই খুড়ো, আমি কৈলাসীকে তোমার পায়ে ফেলে দেব, তারপর তোমার যা খুসি করবে।"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই রমানাথ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং দত্তজা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। দত্তজা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া রহিলেন।

১৪

প্রবল ভূকম্পনে স্রোতের চিরন্তন গতিটা যেমন হঠাৎ এক মুহূর্ত্তে বিভিন্নমুখী হইয়া যায়, তেমনই ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে মানুষের মনের গতিটাও হঠাৎ এমন অসম্ভাবিতরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় যে, তাহাকে পূর্ব্ব পথে ফিরাইয়া আনা কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। দত্তজার মনের অবস্থাও অনেকটা এইরূপ হইয়া আসিল। রমানাথের প্রস্তাবটা লইয়া যতই তিনি মনের ভিতর তোলাপাড়া করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মনটা যেন কৈলাসীর দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িতে লাগিল। ভূমিকম্পে পর্ণ কুটীরটা হেলিয়া পড়িলে অল্প আয়াসেই তাহাকে পুনরায় খাড়া করা যায়, কিন্তু প্রস্তরময়

অট্টালিকা একপাশে ঝুঁকিয়া পড়িলে তাহাকে সহজে খাড়া করা যায় না। দত্তজা আপনার বয়সের আধিক্য, সংসারের দুঃখ ক্লেশ, শোক তাপ, বৈরাগ্য বিরক্তি, কোন কিছু দিয়াই মনটাকে কৈলাসীর দিক হইতে ফিরাইতে পারিলেন না। ফিরাইবার জন্য যত বেশী চেষ্টা করিতে লাগিলেন, চঞ্চল চিত্তপতঙ্গ তত বেশী কৈলাসীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে লাগিল। সে আকর্ষণের নিকট হরিনামের মালা, মনঃশিক্ষার উপদেশ, মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব সকলই যখন ব্যর্থ হইবার উপক্রম হইল, তখন দত্তজা খাতকাদের খাতাপত্র লইয়া সুদ আসলের হিসাবের মধ্যে মনটাকে ডুবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ইহার ফলে দেনাপাওনার অনেক বড় বড় ফর্দ্দ বাহির হইল, ভজহরির তাগাদার কাজ বাড়িয়া গেল, খাতকেরা তাগাদার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। বিরক্ত হইয়া কেহ মহাজনকে গালি দিল, কেহ বা ভয়ে ভয়ে টাকার যোগাড়ে প্রবৃত্ত হইল, যে নিতান্ত নিরুপায়, সে দত্তজার দরজায় হাঁটাহাটি করিয়া তাঁহাকে অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল। দত্তজা তাহাদের সঙ্গে বকাবকি করিয়া, টাকা না দিলে নালিশের ভয় দেখাইয়া তাহাদিগকে আরও ব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। দুই একজন খাতকের নামে নালিশ রুজু করিয়াও ফেলিলেন।

তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া শুধু খাতকেরা নয়, ভজহরি পর্য্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাদে কত্তা, তোমার এ আবার হ'লো কি?"

দত্তজা বিরক্তির সহিত উত্তর করিলেন, "আমার কি হ'তে দেখলি বল্ তো? প'ড়ো টাকা আদায় করবো না?"

ভজহরি বলিল, "টাকা আদায় করবে না তো ছেড়ে দেবে কি? কিন্তু তোমার ভাবভঙ্গী সব যেন উল্টে গিয়েছে।"

দত্তজা যেন কথাটা বুঝিতে না পারিয়া ভজহরির মুখের দিকে চাহিলেন। ভজহরি বলিল, "আজ বিশ বচ্ছর তোমার কাছে আছি কত্তা, ভাল কর মন্দ কর, ভজাকে না ব'লে কোন কাজ করেছ কি?"

দত্তজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজই তোকে না ব'লে কি কাজ ক'রেছি?"

মাথাটা আস্তে আস্তে নাড়িতে নাড়িতে ভজহরি একটু অভিমানের সুরে বলিল, "কিছু কর আর নাই কর, তুমি মনিব আমি চাকর, সব কথা আমাকেই বা বলতে যাবে কেনে?"

ললাট কুঞ্চিত করিয়া দত্তজা বলিলেন, "মর্ বেটা, কোন্ কথাটা তোর কাছে লুকিয়েছি তাই বল্ না।"

ভজহরি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "লুকোবে কেনে কত্তা, তবে বিয়ে করবে একথাটা তো আমাকে বল নি।"

দত্তজা যেন চমকিয়া উঠিলেন; একটু উগ্রভাবে বলিলেন, "আমি বিয়ে করবো? কে বল্লে?"

ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে ভজহরি বলিল, "হাটের দোরে কি আগড় থাকে কত্তা। সারা গাঁয়ে ঢিঢি পড়ে গেছে, রমানাথ বাবুর মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে।"

দত্তজার মুখমণ্ডল মুহূর্ত্তের জন্য লাল হইয়া উঠিল। তিনি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া ম্লানহাস্য সহকারে ধীরে ধীরে বলিলেন, "হাঁ হাঁ, রমা কথাটা তুলেছিল বটে। তা এরি মধ্যে গাঁয়ে রাষ্ট্র হ'য়েছে?"

ভজহরি বলিল, "হয়েছে ব'লে হ'য়েছে. গাঁয়ের ছেলে বুড়ো মেয়ে মদ্দ এই নিয়ে হৈ হৈ কত্তে নেগেচে। আমাকে যেন ছিঁড়ে খায়। কেউ বলে, হাঁরে ভজা, তোর মনিব কি মেয়েটাকে সাথে নিয়ে মক্কা যাবে; কেউ বলে—"

ধমক দিয়া দত্তজা বলিলেন, "হাঁ হাঁ, বলে। তোকেই লোকে যত কথা বলতে যায়, আমার কাছে তো কোন বেটাই টুঁ শব্দটী করে না? তুই যেমন হতভাগা, লোকগুলাও তেমনি কি না।"

বলিয়া তিনি বিষ্ণুস্মরণপূর্ব্বক মালাছড়া ঘুরাইতে লাগিলেন। ভজহরি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি সত্যিই কি বিয়ে করবে কত্তা?"

দত্তজা মুখ তুলিয়া ধীর শান্ত স্বরে বলিলেন, "তুই যেমন পাগল। আমি বিয়ে করবো, এই বয়সে?"

একটু থামিয়া দত্তজা পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "বল্‌চি তো, রমা কথাটা তুলেছিল। একেবারে নাছোড়বান্দা। বলে, তোমাকে এ কাজ কত্তেই হবে খুড়ো।"

ভজহরি বলিল, "কেন, তার মেয়ের কি বর জোটে না?"

দত্তজা বলিলেন, "জুটবে না কেন, কিন্তু তার মতলবটা কি বুঝেছিস্ কিছু? এক তো আধলা পয়সাটী খরচ হবে না; তার

পর আমি যে শ' দেড়েক টাকা পাব তা আর দিতে হবে না। তার পর আমি আর ক'দিন, একবার চোখ বুজলেই টাকা কড়ি জমি জায়গা সবই তার। বুঝলি তো?"

ভজহরি ঘাড় নাড়িয়া ইহাতে সায় দিয়া বলিল, "তা বটে কর্ত্তা।"

দত্তজা বলিলেন, "তা বটে কেন, তুই দেখে নিবি ভজা, আমার কথা ঠিক কি না। কিন্তু আমি কি এমনি পাগল যে, তার কথায় ভুলে যাব।"

আত্মগরিমাসূচক মৃদু হাস্য করিয়া দত্তজা পুনরায় বলিলেন, "যত গোল বাধালে মানকে ছোঁড়া। সে হতভাগা যদি এসে না জুটবে, তবে এত উৎপাত বাধবে কেন? ছোঁড়া সেই চলে গেল, মাঝে হ'তে আমাকে এই ফ্যাসাদে ফেলে গেল।"

বলিয়া দত্তজা ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিলেন, এবং মুখ ফিরাইয়া পুনরায় জপে মনোনিবেশ করিলেন। তৃতীয়ার ক্ষীণ চন্দ্রকিরণ ধীরে ধীরে পশ্চিম আকাশে মিলাইয়া যাইতেছিল। সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া দত্তজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা ভজা, তোর কি মনে হয়, মানকে আবার আসবে?"

ভজহরি উত্তর করিল, "আসতেও পারে।"

দত্তজা বলিলেন, "আসতেও পারে, না আসতেও পারে। আসবে যে তারি এমন ঠিক কি। আর আসুক না আসুক, তাতে আমার ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নাই। আমার আর কি, গাঁটরী বেঁধে বেরুলেই হ'লো।"

ভজহরি আলস্য ভাঙ্গিয়া একটা হাই তুলিয়া বলিল, "ছোকরা এদিকে যাই হোক, লোক কিন্তু মন্দ ছিল না।"

তর্জ্জন করিয়া দত্তজা বলিলেন, "ভাল তো কত! এত বড় ছোকরা, সংসারের একটা কাজে নাই, খালি হো হো টো টো ক'রে ঘুরে বেড়াতে জানে। তবে একটা গুণ, গাইতে পারে বেশ। গলাটাও মিষ্টি, সুরবোধও একটু আছে। কেমন না?"

মুখ মচকাইয়া ভজহরি বলিল, "কে জানে, অত বোধ শোধ কি আমাদের আছে। তবে নট বাউরি বলে তালে মেলে না।"

ঝঙ্কার দিয়া দত্তজা বলিলেন, "না মেলে না। নট বাউরি মস্ত ওস্তাদ কি না। আমি নিজে তাল দিয়ে দেখেছি, চমৎকার মেলে। সেই যে কি গানটা এময় সময় গাইতো, তোর মনে নাই?"

"কোন্ গানটা?"

"সেই যে রে, সেই গানটা। নাঃ, তুই বেটা নেহাৎ বোকারাম, তোর কিছু মনে থাকে না। আমার কিন্তু গানটা বড্ড মিষ্টি লাগতো। আহা চমৎকার গানটা! মনে আস্‌চে, আর আস্‌চে না।"

ললাট কুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে ভাবিতে দত্তজা বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ হাঁ, মনে পড়েছে। সেই যে রে, "রাঙা ফল", তার পর কি?"

ভজহরি বলিল, "আমার কি ফলের অভাব।"

ক্রুদ্ধভাবে দত্তজা বলিলেন, "দূর বেটা, এর ভেতর অভাব এলো কোথা হ'তে? হাঁ হাঁ, হয়েছে, হয়েছে,

"রাঙা ফলে আর আমি ভুলিব না মা এবার"

ঠিক রাঙা ফলই বটে, কেমন ভজা?"

মালা হাতে রাখিয়া, অস্তোমুখ চাঁদের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দত্তজা গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতে লাগিলেন—

"রাঙা ফলে আর আমি ভুলিব না মা এবার,
খাইয়ে দেখেছি মাগো নাহি যে কোন সুতার,
সে যে পূরিত গরলে
খাইলে কুফল ফলে,
মা হ'য়ে সন্তানের মুখে দিও না গো জননী।
তনয়ে তার তারিণী।"

গানের সঙ্গে সঙ্গে দত্তজা বাঁ হাতে তাল দিতে লাগিলেন। ভজহরি উঠানে ছেঁড়া মাদুরখানা পাতিয়া শুইয়া পড়িল।

বাহির হইতে হারু পাল ডাকিল, "কত্তা মশাই!"

দত্তজা সচকিত ভাবে কাণ খাড়া করিলেন। হারু পনরায় ডাকিল, "কত্তা মশাই! ভজু মামা, ও ভজু মামা!"

"কে, পালের পো?" বলিয়া ভজহরি উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল। হারু বাড়ী ঢুকিয়া দত্তজাকে নমস্কার করিয়া ভজহরির মাদুরের এক পাশে বসিল।

১৫

দত্তজা হাতের মালা উচু করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "খবর কি হে হারাধন ?"

হারু সবিনয়ে উত্তর করিল, "আপনকার আশীর্ব্বাদে খবর সব ভাল কত্তা মশাই।"

"ছেলেটী সেরে উঠেছে ?"

"আপনকার কিরপায় আজ তিন দিন হ'লো পত্তি পেয়েছে। ব্যামোটা কি কম হ'য়েছিল কত্তা, গণেশ ডাকতর তো জবাবই দিয়েছিল। সেই রাত্তিরে আপনি যদি টাকা দু'টো না পাঠাতে—"

বাধা দিয়া দত্তজা বলিয়া উঠিলেন, "আমি কি সহজে টাকা বের করেছি পালের পো, ঐ ভজা বেটাকে বল না, বেটা পালের পো পালের পো ক'রে আমাকে যেন পাগল ক'রে তুললে। বেটা শেষে মেয়ে মানুষের মত কেঁদে ফেললে হে। কাজেই বলি, নে বেটা দু'টো টাকা। তা নইলে গোবিন্দ দত্তর হাত থেকে সহজে কি দু' দুটো টাকা বেরোয়। চৌষট্টি টাকার এক মাসের সুদ।"

বলিয়া দত্তজা সহাস্যে মস্তক সঞ্চালন করিলেন। হারু কৃতজ্ঞতাপূর্ণ স্বরে বলিল, "সে যাই বল কত্তা, আপনকারকে কি চিনি না। আপনি হচ্চেন গাঁয়ের মাথা, গরীবের মা বাপ। আপনকার ধার কি শুধতে পারবো কত্তা ?"

এই অতি প্রশংসার অর্থ যে কি তাহা দত্তজার জানা ছিল। টাকার দরকার না পড়িলে কেহ এত প্রশংসা করে না। সুতরাং ইহাতে কোনরূপ হর্ষপ্রকাশ না করিয়া তিনি নীরবে বসিয়া রহিলেন। হারু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "ছেলেটার অসুখের সময় শামতার বাবা পঞ্চানন্দর কাছে মানত ক'রেছিলাম। আজ সেই মানত শুধতে গিয়েছিলাম। বাতাসা কিনতে বাজারে যাচ্চি, হঠাৎ মাণিক বাবুর সাথে দেখা।"

দত্তজা একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাণিক! মাণিক ওখানে কোথা হ'তে এলো?"

হারু বলিল, "যাত্রা কত্তে এয়েচে। চাঁদপুরের রায়েদের বাড়ীতে বিয়ে ছিল কি না, তাই আজ তিন দিন যাত্রা হচ্চে।"

বিমর্ষভাবে দত্তজা বলিলেন, "বটে। তা হ'লে আবার যাত্রার দলে ঢুকেচে। কিছু বললে হে হারাধন?"

হারু বলিল, "বললে বৈ কি, কত দুখ্যু কত্তে লাগলো। বলে, পালের পো, দাদামশায়ের কাছে দিব্যি ছিলাম, এ শালার যাত্রার দলে ঢুকে না পাই খেতে, না পাই শুতে। আজ দু'রাত তো চোখে পাতায় হয় নি।"

দত্তজা যেন উৎফুল্ল ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "এই দেখ্ ভজা, আমি যা বলেছি, ঠিক কি না। এমন সুখ পাবে কোথায়? হুঁ হুঁ, বুড়ো বেটা যে বড্ড মন্দ।"

বলিয়া দত্তজা একটু শ্লেষের হাসি হাসিলেন, এবং হারাধনকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার পর?"

হারু বলিল, "তার পর আমি আমার সাথে আসতে বললুম। তা বলে, এখন গান হচ্চে, দল ছেড়ে কি ক'রে যাই বায়নাগুলো চুকে গেলে পারি তো একবার যাব।"

ভ্রুভঙ্গী করিয়া দত্তজা বলিলেন, "ওঃ, পারিতো একবার যাব। এসে আমাকে কৃতার্থ করবেন আর কি।"

বলিয়া দত্তজা গম্ভীর মুখে বসিয়া রহিলেন। মৃদুস্বরে ভজহরিকে সম্বোধন করিয়া হারু বলিল, "একটু আগুন কর না, ভজু মামা।"

ভজহরি তামাক সাজিতে উঠিল। দত্তজা হারুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার কথা কিছু বললে ?"

হারু। বললে বৈকি। দাদামশায় কেমন আছে, আমার তরে ভাবে নাকি, এই রকম কত কথা জিগ্যেস করলে।"

তীব্র হাসি হাসিয়া দত্তজা বলিলেন, "বটে, ভারী আমার দরদী লোক কিনা, আমি বাবুর তরে ভাববো। ওঃ, ভেবে ভেবে তো আমার পেটের ভাত চাল হ'য়ে যাচ্চে। আমার তো আর কোন ভাবনা নাই ? বলতে একটু লজ্জা পেলে না হে হারাধন ?"

এ প্রশ্নের উত্তর হারাধন দিতে পারিল না ; সে নীরবে বসিয়া আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে ভজহরির হাতের কলিকার দিকে চাহিয়া রহিল। ভজহরি কিন্তু চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না ; সে দত্তজার প্রশ্নের উত্তরে বলিল, "হক্ কথা বলবো কত্তা, তুমি তার তরে ভাবচো না কোন্‌খানটায় ?"

গর্জ্জন করিয়া দত্তজা বলিলেন, "কি, আমি তার তরে ভাবচি, এত বড় কথা তুই বলিস ভজা? আমার গলায় কি দড়ী জোটে না? আমি পরকালের ভাবনা রেখে সেই হতভাগার কথা ভাবতে যাব? কেন, সে আমার কে বল্ তো?"

কর্ত্তার ক্রোধের উদ্রেক দর্শনে ভজহরি চুপ করিল এবং কলিকায় আগুন ধরাইয়া দত্তজার হাতে হুঁকা দিতে গেল। দত্তজা হাতের মালা ছড়া গলায় ফেলিয়া ভজহরির দিকে সরোষ কটাক্ষ নিক্ষেপপূর্ব্বক হাত বাড়াইয়া হুঁকা লইলেন। চিন্তিত ভাবে হুঁকায় টান দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি জিগ্যেস্ করলে? তার তরে আমি ভাবি কি না। বাহবা মাণিক চন্দর! তুমি তার কি উত্তর দিলে হে হারাধন?"

হারাধন খুব সোজা উত্তরই দিয়াছিল। মাণিককে ফিরাইবার উদ্দেশ্যে দত্তজা তাহার জন্য চিন্তিত কি না ইহা না জানিলেও সে এ কথাটা মাণিকের কাছে খুব করুণ রস মিশাইয়াই প্রকাশ করিয়া আসিয়াছিল। তা ছাড়া দত্তজা যে পুনরায় বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছেন এবং বোধ হয় এই মাসের শেষাশেষি তাঁহার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইবে এমন কথাও বলিয়াছিল। তাহা শুনিয়া মাণিক খুব হাসিয়াছিল এবং কোন্ তারিখে বিবাহ হইবে তাহা জানিতে পারিলে যেরূপে হউক সেই দিনে উপস্থিত হইয়া লুচী না খাইয়া ছাড়িবে না ইহা উপহাসের সহিত হারাধনকে বলিয়া দিয়াছিল। কিন্তু দত্তজার রাগ দেখিয়া হারাধন সে সকল কথা প্রকাশ করিতে পারিল না; আমতা আমতা করিয়া উত্তর দিল,

"আমি আর কি বলবো কত্তা, আমি বললাম, ভাববার মত লোক হ'লেই ভাবতে হয়, পরের ভাবনা কি কেউ ভাবে।"

উৎসাহে চীৎকার করিয়া দত্তজা বলিলেন, "বেশ বলেছ হারাধন, উচিত জবাব দিয়েছ। যদি তার বুদ্ধি থাকে, এইতেই বুঝে নেবে। কেমন ঠিক কি না?"

হারাধন বলিল, "বটেই তো কত্তা। তা তেনার সাথে দেখা হ'লো, ভাবলুম, আপনকারকে খবরটা দেওয়া দরকার। তাই কাজকর্ম্ম সেরে বলতে এলুম।"

দত্তজা হুঁকার মাথা হইতে কলিকা খুলিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, "খবর দিয়ে ভালই করেছ। তা হ'লে সে আর আসবে না?"

হারু বলিল, "কথার ভাবে যে রকম দেখলুম, তাতে বোধ হয় আসতেও পারে।"

দত্তজা গভীর উপেক্ষাসূচক স্বরে বলিলেন, "আসে আসবে, না আসে আরও ভাল। আমার কি এ বয়সে পরের এত ঝঞ্ঝাট ভাল লাগে? আমার এখন চুপ ক'রে এক জায়গায় ব'সে হরিনাম করবার সময়। করবোও তাই, একবার দেনা পাওনাগুলোর জের মেটাতে পারলে হয়।"

হারু তামাক খাইয়া বিদায় লইল। ভজহরি সদর দরজা বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিলে দত্তজা তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখলি ভজা, আমি তো বলেছি, যাবে কোথায়, আশে পাশেই ঘুরে বেড়াচ্চে, লজ্জায় আসতেও পাচ্চে না। মতলবটা

এই, আমি ডেকে নিয়ে আসি। কিন্তু সেটী আর হচ্চে না। কেমন, আমার কি সাধতে যাওয়া ভাল দেখায়?"

মাথা নাড়িয়া ভজহরি বলিল, "আরে রামঃ।"

দত্তজাও মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "ঠিক বলেছিস্। তা হ'লে বাবুর পায়া আরও উঁচু হ'য়ে উঠবে। রামঃ রামঃ! আসুক, না আসুক, চুলোয় যাক, আমি আর ও নামটী কচ্চি না।"

অন্যমনস্কভাবে পোড়া কলিকায় টান দিয়া দত্তজা মুখ বিকৃত করিলেন, এবং হুঁকাটা রাখিয়া বিকৃতমুখে বলিলেন, "আর ভাল লাগে না ভজা, দূর হোক্, পালাই চল্। কাল রমাকে ডেকে পষ্ট বলবো, না বাপু, অন্যত্র চেষ্টা দেখ। তারপর দু'টো মামলা আছে। নাঃ জ্বালাতন! মামলা মোকদ্দমা, সাক্ষী সাবুদ—কি হবে আর ভজা? সঙ্গে কিছু যাবে কি? এই যে না খেয়ে না প'রে টাকাগুলো জমিয়েছি, তার ক'টা সঙ্গে যাবে?"

ভজহরি বলিল, "একটাও যাবে না কত্তা, একটাও যাবে না।"

ক্ষোভরুদ্ধকণ্ঠে দত্তজা বলিলেন, "তবে আর কেন ভজা, চুলোয় যাক্ সব, এদের মায়া কাটিয়ে চাকর মনিবে, বাপ বেটায় দু'জনে চলে যাই আয়। যাবি ভজা?"

দত্তজার সে কাতরতাপূর্ণস্বরে ভজহরি একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে মুখটা নীচু করিয়া ভারী গলায় বলিল, "এক্ষুনি কত্তা, এক্ষুনি।"

দত্তজা বলিলেন, "তাই চল্ ভজা, তোর ম'লে কাঁদতে নাই,

আমারো হারালে খুঁজতে নাই, চল দেখি, দু'জনে গিয়ে বিশ্বনাথের পায়ে আছাড় খেয়ে পড়ি, দেখি এ জ্বালার শান্তি হয় কি না।"

ভজহরি বলিল, "যেতে পারবে কত্তা?"

গর্জ্জন করিয়া দত্তজা বলিলেন, "পারবো না? তুই বলিস্ কি রে ভজা, এমন কি আছে যাকে ফেলে যেতে পারবো না। সবাই মায়ার শক্ত বাঁধন কেটে চলে গেল, আর আমি এই আল্‌গা দড়িটা ছুঁড়ে ফেলে যেতে পারি না? আচ্ছা, তল্‌পী বাঁধ ভজা, দেখি যেতে পারি কি না।"

উৎসাহে উত্তেজনায় দত্তজার স্বর যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল। ভজহরি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া নির্ব্বাক্ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। রাস্তা দিয়া কে গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল—

এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক ক'রে।
যাতে ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য নরে কি তা জানতে পারে।

দত্তজা উৎকর্ণ হইয়া গানটা শুনিতে লাগিলেন। গায়ক গাহিতে গাহিতে চলিল—

"গুটী পোকায় গুটী করে,
কাটলে সে তো কাটতে পারে,
মহামায়ায় বদ্ধ গুটী আপনার নালে আপনি মরে।"

তখন চাঁদের ক্ষীণ রশ্মিটুকু আকাশের কোলে মিলাইয়া গিয়াছে; অন্ধকারের মধ্যে ঝিল্লীর অশ্রান্ত চীৎকারে বেদনার করুণ সুর ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে; তারাগুলা হাজার হাজার

চোখ মেলিয়া বেদনাতুর পৃথিবীর দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। দত্তজা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

১৬

হরিনামের মালা যথাস্থানে তুলিয়া রাখিয়া দত্তজা ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িলেন। শুইলেন বটে, কিন্তু চোখে ঘুম আসিল না। একে নিদারুণ গ্রীষ্ম, তাহার উপর কতকগুলা চিন্তা আসিয়া মাথাটাকে এমন গরম করিয়া দিল যে, ঘুমাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াও ঘুমাইতে পারিলেন না; চোখ টিপিয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিলেন। কাশী যাওয়া তো নিশ্চিত, কিন্তু রমানাথ ছাড়িবে কি? যদি না ছাড়ে, যদি জোর করিয়া কৈলাসীকে তাঁহার হাতে সম্প্রদান করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে কি করিবেন? তাহার এই বলপূর্ব্বক প্রদত্ত দানকে প্রত্যাখ্যান করিয়া তিনি পলাইতে পারিবেন কি? যদি না পারেন, তাহা হইলে এই বয়সে বিবাহ করিয়া আবার সংসার পাতিয়া বসিবেন কি? সে নূতন পাতান সংসার কেমন হইবে?

দত্তজার মনে পড়িল, কতদিন আগে আর একবার এমনি সংসার পাতিয়া বসিয়াছিলেন। তখন প্রাণে কত আশা, কত উদ্যম, অন্তরে কত উৎসাহ, কত শক্তি! তখন এই কঠোর কুৎসিত সংসারটা প্রভাতের স্নিগ্ধ সোণালি রঙের মুখোস পরিয়া কি সুন্দর রূপেই চোখের সামনে দাঁড়াইয়াছিল! কিন্তু আজ তাহার সে ছদ্ম আবরণ খসিয়া পড়িয়াছে, তাহার অন্তরালে

উহার যে স্বাভাবিক বীভৎস মূর্ত্তি লুক্কায়িত ছিল, তাহা প্রকটিত হইয়াছে। সুতরাং এখন আর কোন্ লজ্জায় এই বিকট বীভৎস সংসারটাকে সুন্দর বলিয়া গ্রহণ করা যায়? ছিঃ! অজ্ঞানে যে হলাহল পান করিয়াছি, তাহার জ্বালাতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত; এখন আবার জানিয়া শুনিয়া সেই হলাহল-পাত্র কি মুখের কাছে ধরা যায়!

কিন্তু কৈলাসী? এইখানেই যত গোল। কৈলাসী এই বুড়াকে অসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াই তো যত গোল বাধাইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহার এই স্বীকৃতির মধ্যে যে একটুও সঙ্কোচ নাই, এমন কথা কে সাহস করিয়া বলিতে পারে। "নরের মন দেবতার অগোচর," তাহার উপর স্ত্রীলোকের মন। হয়তো কৈলাসীর মনের ভিতর একটু সঙ্কোচ আছে, কিন্তু সেটুকু সে মুখে প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। অথবা হয় তো সে এই বুড়ার জন্য বুড়াকে চায় না, তাঁহার ঐ টাকাভরা সিন্দুকটার জন্যই তাঁহাকে গ্রহণ করিতে চায়। কে জানে কাহার আকর্ষণে কৈলাসী আকৃষ্ট। কিন্তু যদি সিন্দুকের আকর্ষণটাই প্রবল হয়, তাহা হইলে কৈলাসনাথকে দিয়া কৈলাসীকে ভুলিলে ভাল হয় না?

দত্তজা পাশ ফিরিয়া জানালার দিকে মুখ রাখিয়া শুইলেন। খোলা জানালা দিয়া নক্ষত্রখচিত নীল আকাশটা দেখা যাইতেছিল; কালো আকাশের গায়ে তারকাগুলা হীরকের মত ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। মাঝে মাঝে এক একটা উল্কাখণ্ড অগ্নিময়

গোলকের ন্যায় অন্ধকার শূন্যপথ প্রদীপ্ত করিয়া পৃথিবীর দিকে ছুটিয়া আসিতেছিল। মুক্ত গবাক্ষপথে দৃষ্টি রাখিয়া দত্তজা স্থির ভাবে পড়িয়া রহিলেন। নৈশ শীতল বায়ুপ্রবাহ ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার চিন্তাতপ্ত ললাট স্পর্শ করিতে লাগিল। সে স্নিগ্ধ স্পর্শে দত্তজার চক্ষু ধীরে ধীরে মুদ্রিত হইয়া আসিল।

একটু নিদ্রার আবেশ আসিতেই দত্তজা স্বপ্নে দেখিলেন, যেন তিনি পুনরায় বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছেন; কৈলাসী—যে তাঁহাকে বুড়া বলিয়া উপহাস করিত, সে আসিয়া তাঁহার শূন্য সংসার পূর্ণ করিয়াছে; তাহার আবির্ভাবে জীবনের ম্লানসন্ধ্যা দিবসের স্নিগ্ধ আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। দাবদগ্ধ অরণ্যানী যেন আকালিক বসন্তের কুহকদণ্ড স্পর্শে ফলে ফুলে পল্লবে শাখায় সুশোভিত হইয়াছে। আহা, সংসারের কঠোর বক্ষের মধ্যে এত মাধুর্য্য কোথায় লুকাইয়াছিল!

দত্তজা কিন্তু এই মাধুর্য্য উপভোগ করিবার অবসর পাইলেন না; শুষ্ক সংসার-বৃক্ষটা সহসা সরস হইয়া উঠিলে তাঁহার হৃদয়-বিহঙ্গ যখন সেই নবপল্লবিত বৃক্ষশাখায় নূতন নীড়নির্ম্মাণে ব্যস্ত হইল, তখন নিষ্ঠুর কাল আসিয়া তাহাকে নীড়চ্যুত করিবার উপক্রম করিল। ওহো, বিধাতার একি কঠোর পরিহাস! যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া কত দিন অপেক্ষা করিয়াছেন, তখন কেহ লইতে আসিল না; আর এখন—হা ভগবান, কৈলাসীর কি হইবে? বৃদ্ধের দুই চোখ বাহিয়া দর দর ধারায় অশ্রু গড়াইতে লাগিল। কিন্তু কৈলাসীর চোখে জল ছিল না,

মুখে একটুও বিবর্ণতার ছায়া ছিল না। সে শান্ত প্রফুল্লবদনে আসিয়া দত্তজার পাশে বসিল, এবং ধীর অকম্পিত হস্তে তাঁহার কটিদেশ হইতে সিন্দুকের চাবীটা খুলিয়া লইল। অশ্রুগাঢ় স্বরে দত্তজা ডাকিলেন, "কৈলাসী!" কৈলাসী তাঁহার আহ্বানে কোন উত্তর দিল না, ফিরিয়াও চাহিল না; সে ধীর গম্ভীর পদে গিয়া সিন্দুকের চাবি খুলিল। দত্তজা মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে তাহার কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

কৈলাসী সিন্দুকের ডালা তুলিয়া একে একে অর্থরাশি বাহির করিতে লাগিল। নোটের তাড়াগুলা বাহির করিল, নগদ টাকার গামলাটা বাহির করিয়া তাহার পাশে রাখিল; টাকার সংঘর্ষণজনিত ঝন্ ঝন্ শব্দে স্তব্ধ কক্ষ শব্দিত হইয়া উঠিল! দত্তজার বুকের ভিতর ধড়াস্ ধড়াস্ শব্দ হইতে লাগিল। তারপর কৈলাসী সোণা রূপার বন্ধকী গহনাগুলা একে একে বাহির করিয়া ফেলিল। ওঃ, কতদিনের কত কষ্টে সঞ্চিত অর্থরাশি! দত্তজা চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "কৈলাসী, কৈলাসী!" কৈলাসী সে চীৎকারে ভ্রূক্ষেপ করিল না; সে আঁচল পাতিয়া তাহাতে সেই নোট, টাকা, গহনাগুলা তুলিতে লাগিল। সব যায়, সব যায়। দত্তজার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছুটিল, অন্তিমের সকল শক্তি একত্র করিয়া তিনি উঠিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু চেষ্টা নিষ্ফল হইল; মাথা তুলিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেই কাঁপিতে কাঁপিতে সশব্দে পড়িয়া গেলেন। কৈলাসীর খল্ খল্ হাস্যধ্বনিতে

ঘরখানা কাঁপিয়া উঠিল। দত্তজা প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার করিয়া ডাকিতে গেলেন—ভজা! ভজা!

ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; দত্তজা ধড় মড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন। ঘরের ভিতর গাঢ় অন্ধকার। দুই হাতে চোখ মুছিয়া দত্তজা বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। বাহিরেও নিবিড় অন্ধকার; কালো মেঘে আকাশ ঢাকিয়া গিয়াছিল; মেঘের বুক চিরিয়া বিদ্যুতের লোল শিখা আকাশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে নাচিয়া বেড়াইতেছিল; মেঘের গর্জ্জনে বায়ুর হুঙ্কারে নৈশপ্রকৃতির বক্ষে যেন একটা প্রলয় কাণ্ডের সূচনা হইতেছিল।

দত্তজা ভয়ে ভয়ে জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন, এবং বালিশের নীচে হইতে দেশালাই বাহির করিয়া আলো জ্বালিয়া ফেলিলেন। ঘরের অন্ধকার দূর হইল, দত্তজার বুকের কাঁপুনিটাও অনেক কমিয়া আসিল।

তারপর দত্তজা আলো লইয়া দরজাটা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। দরজা যেমন বন্ধ করিয়া শুইয়াছিলেন তেমনই বন্ধ রহিয়াছে। সেখান হইতে ফিরিয়া তিনি সিন্দুকের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। সিন্দুকের তালা ধরিয়া টানিলেন; তালা বন্ধ, তাহা খুলিল না। দত্তজা তখন আপনার কোমর হইতে চাবী লইয়া তালা খুলিলেন এবং আলো লইয়া সিন্দুকের অভ্যন্তর ভাগ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। বাতাসে দরজার শিকলটা নড়িয়া উঠিল; দত্তজা চমকিয়া কান খাড়া করিলেন। না, বাতাসের শব্দ। আবার

তিনি ঝুঁকিয়া সিন্দুক পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। নোটের তাড়া, টাকার গামলা, গহনার বাক্স, সব ঠিক আছে, এক চুলও এদিক ওদিক হয় নাই। এই যে এক শত টাকার নম্বরী নোট, এই দশ টাকার, এই পাঁচ টাকার নোট; এই যে নগদ টাকা। আলোকের প্রতিবিম্বনে টাকাগুলা ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল। দত্তজা মুগ্ধ অনিমেষনেত্রে কিয়ৎক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ঠক্ ঠক্ করিয়া জানালার কপাট নড়িয়া উঠিল; দত্তজা তাড়াতাড়ি সেই দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। এমন সময় আকাশ পৃথিবী কাঁপাইয়া কড় কড় শব্দে বাজ ডাকিল। সে বিকট শব্দে দত্তজা যেন থর থর কাঁপিয়া উঠিলেন। তিনি কম্পিত হস্তে সিন্দুক বন্ধ করিয়া বিছানায় আসিয়া বসিলেন। একবার জানালাটা খুলিলেন। উঃ, প্রকৃতির বুকে কি ভীষণ তাণ্ডবলীলা চলিতেছে! বাতাসের একটা দম্‌কা আসিয়া আলো নিবাইয়া দিল। দত্তজা জানালা বন্ধ করিয়া বিছানায় পড়িয়া স্বপ্নের কথাটা ভাবিতে লাগিলেন।

স্বপ্নটা নিশ্চেষ্ট মস্তিষ্কের খেয়াল মাত্র, ইহার সহিত সত্যের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই, এইরূপ মত যাঁহারা প্রকাশ করেন, দত্তজা তাঁহাদের দলভুক্ত ছিলেন না। স্বপ্ন অমূলক হইলেও ইহার মধ্যে কতকটা সত্য যে নিহিত থাকে, সে বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। সুতরাং তাঁহার মনে হইল, অচিরপূর্ব্বে দৃষ্ট স্বপ্নের ভিতর দিয়া তাঁহার নিজের পরিণাম স্পষ্ট সূচিত হইয়াছে; লালসার মোহে মুগ্ধ হইয়া বিবাহ করিলে তাঁহার এইরূপ শোচনীয় পরিণামই

সংঘটিত হইবে। উঃ, কি ভীষণ পরিণাম! দত্তজা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, এমন কাজ প্রাণ থাকিতে করিবেন না।

বাহিরে তখনও প্রকৃতির তাণ্ডব-নৃত্য চলিতেছিল। মেঘের গর্জ্জনে, বাজের ডাকে, বাতাসের শব্দে নৈশ প্রকৃতি উন্মাদিনীর ন্যায় নৃত্য করিতেছিল। প্রকৃতির সেই তাণ্ডবলীলা শুনিতে শুনিতে দত্তজা ঘুমাইয়া পড়িলেন।

সকালে ভজহরির ডাকে ঘুম ভাঙ্গিলে দত্তজা উঠিয়া দেখিলেন, অনেক দিনের পর বৃষ্টিধারায় স্নাত হইয়া ধরণী নূতন শ্রী ধারণ করিয়াছে; বর্ষণসিক্ত বৃক্ষপত্রের উপর প্রভাতের স্বর্ণদ্যুতি নাচিয়া নাচিয়া ক্রীড়া করিতেছে। দত্তজা হুঁকা হাতে বাহিরে বসিয়া হরিৎপল্লবে স্বর্ণরশ্মির চঞ্চল নৃত্য দেখিতে লাগিলেন।

রমানাথ ধীরে ধীরে সম্মুখে আসিয়া বলিল, "রাত্রে কি দুর্য্যোগটাই গিয়েছে খুড়ো!"

গম্ভীরভাবে দত্তজা উত্তর দিলেন, "হুঁ।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৈলাসী ক'দিন এদিকে আসে নাই যে?"

রমানাথ বলিল, "বোধ হয় লজ্জায় আসে নি।"

মৃদু হাসিয়া দত্তজা বলিলেন, "চেনা ঘর, চেনা বর, এতে আর লজ্জা কি?"

রমানাথও একটু হাসিল। দত্তজা বলিলেন, "আজ একবার পাঠিয়ে দিও তো।"

রমানাথ বলিল, "আচ্ছা।"

১৭

কৈলাসীকে দেখিয়াই দত্তজা গাহিয়া উঠিলেন—

"এসো এসো বঁধূ এসো আধ আঁচরে বোসো
নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।"

কৈলাসী লজ্জানত মস্তকে একপাশে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আমাকে ডেকেচো দাদামশায়?"

সহাস্যে দত্তজা বলিলেন, "না ডাকলে যখন দেখা পাই না, তখন কাজেই ডাকতে হয়েছে।"

কৈলাসী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দত্তজা বলিলেন, "বুড়ো এমন কি অপরাধ করেছে কৈলাসেশ্বরী, যে আজ পাঁচ দিন সে তোমার দর্শনে বঞ্চিত?"

লজ্জার মৃদু হাসি হাসিয়া কৈলাসী বলিল, "কেন ডেকেছ?"

দত্তজা বলিলেন, "ডেকেছি তোমায় দেখবো ব'লে, তোমার সুধামাখা বচনাবলী শ্রবণে আমার তৃষিত কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করবো ব'লে।"

বলিয়া দত্তজা গান ধরিলেন—

"দেখবো শুধু মুখখানি,
শোনাও যদি শুনবো বাণী,
আড়াল থেকে হাসি দেখে
চলে যাব দেশান্তরে।"

কৈলাসী এবার হাসিয়া উঠিল; বলিল, "দেশান্তরে যাবে কোন্ দুঃখে দাদামশায়?"

দত্ত। দুঃখ এই যে, বুড়োর দুঃখ কেউ বোঝে না।

কৈলা। কেউ বোঝে না?

দত্ত। যারা বোঝে, তারাও অবুঝ হয়ে থাকে।

কৈলা। তাদের কি কত্তে বল?

দত্ত। তাদের বলি, ওহে বাপু, সখটা কি তোমাদেরি এক-চেটে? তাই তোমরা বেছে বেছে যত ষোড়শী সুন্দরীগুলিকে হাত করে নেবে, আর বুড়োরা হাঁ করে তোমাদের মুখের দিকে চেয়েই সখ্ মিটিয়ে নেবে?

কৈলা। তাই বুঝি মনের খেদে দেশান্তরে যাবে দাদামশায়?

দত্তজা হাসিয়া বলিলেন, "যে আমার শত্রু সে দেশান্তরে যাক্, আমি শ্রীমতী কৈলাসমণিকে নিয়ে মনের সুখে গৃহবাসী হব।"

বলিয়া তিনি কৈলাসীর মুখের উপর হাস্যপ্রদীপ্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই কৈলাসীর মুখখানা সায়ং-সূর্য্যের স্বর্ণরশ্মি-রঞ্জিত মেঘ-খণ্ডের ন্যায় লোহিত বর্ণ ধারণ করিল। দত্তজা বসিয়াছিলেন, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আয়।"

দত্তজা দরজা খুলিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিলেন। কৈলাসী ধীরে ধীরে তাঁহার অনুসরণ করিল।

দত্তজা গিয়া সিন্দুকের চাবা খুলিলেন, এবং তাহার ডালাটা তুলিয়া ধরিয়া কৈলাসীকে বলিলেন, "এই দেখ্।"

কৈলাসী কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে সিন্দুকের ভিতর দৃষ্টি নিক্ষেপ

করিল, এবং চঞ্চল দৃষ্টিটা ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিতভাবে বলিয়া উঠিল, "তোমার এত টাকা, দাদামশায় ?"

ঈষৎ হাসিয়া দত্তজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত টাকা বল দেখি ?"

কৈলা। চার পাঁচ শো হবে।

দত্ত। দূর, চার পাঁচ হাজার বল্।

কৈলা। হাজার ? সে কত ?

বলিয়া সে মুখ তুলিয়া দত্তজার দিকে চাহিল।

দত্তজা বলিলেন, "হাজার জানিস্ না ? দশ শ'য়ে এক হাজার। পাঁচ হাজারে পাঁচ দশে পঞ্চাশ শো।"

আশ্চর্য্যের সহিত কৈলাসী বলিয়া উঠিল, "উঃ, পঞ্চাশ শো ?"

ঈষৎ হাসিয়া দত্তজা বলিলেন, "আবার এ দিকে কি আছে দেখ্।"

কৈলাসীর আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিটা পুনরায় সিন্দুকের মধ্যে নিপাতিত হইল। একটা পিতলের গামলায় বিস্তর সোণা-রূপার গহনা ছিল। অলঙ্কাররাশির জ্যোতিতে সিন্দুকের অভ্যন্তর ভাগ যেন জ্বল্ জ্বল্ করিতেছিল। তাহাদের দিকে চাহিয়া কৈলাসী বিস্ময়জড়িত কণ্ঠে বলিল, "এ যে বিস্তর গয়না।"

দত্তজা নীরবে মৃদু হাস্য করিলেন। কৈলাসী মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এত টাকা, এত গয়না, কা'কে দেবে দাদামশায় ?"

দত্তজা বলিলেন, "যাকে ইচ্ছা দিয়ে যাব।"

কৈলাসী মুখ নামাইয়া অলঙ্কারপাত্রের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। দত্তজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই নিবি ?"

বিস্ময়ে শিহরিয়া কৈলাসী বলিয়া উঠিল, "আমি !"

স্থির গম্ভীর কণ্ঠে দত্তজা বলিলেন, "এগুলো দেবার আর ক'টা লোক আছে কৈলাসী ? একটা এসেছিল, কিন্তু যে পথে এলো, সেই পথেই চলে গেল।"

দত্তজা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া একটু দম লইয়া বলিলেন, "কিন্তু তোকে একটু বেছে নিতে হবে। ধর্, এক দিকে এই টাকা গয়নাভরা সিন্দুকটা, অপর দিকে এই বুড়ো। তুই কোন্‌টা চাস্ ?"

প্রশ্নটা যে কত কঠিন তাহা বুঝিলেও দত্তজা উত্তরের আশায় কৈলাসীর মুখের দিকে চাহিলেন।

কৈলাসী কিন্তু ইহার উত্তর দিতে পারিল না; সে অবনত দৃষ্টিতে কেপমান বক্ষে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পরও কোন উত্তর না পাইয়া দত্তজা ভাঙ্গা মেঘের কোলে ক্ষীণ বিদ্যুতের মত ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তোকে আর উত্তর দিতে হবে না।"

বলিয়া তিনি সিন্দুকের ভিতর হইতে গহনার পাত্রটা বাহির করিলেন, এবং তাহা হইতে এক এক খানি গহনা লইয়া ধীরে ধীরে কম্পিত হস্তে কৈলাসীকে পরাইতে লাগিলেন। কৈলাসী বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

যেখানে যত গহনা ধরে, একে একে সব পরাইয়া দিয়া দত্তজা স্থির প্রোজ্জ্বলদৃষ্টিতে কৈলাসীর মুখের দিকে চাহিলেন। একে তো কৈলাসীর রূপের অভাব ছিল না, তাহার উপর অলঙ্কারের প্রভায় সে রূপের জ্যোতি যেন শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। দত্তজা মুগ্ধ নির্নিমেষ নেত্রে সে রূপ-সুধা আকণ্ঠ পান করিতে লাগিলেন। মনে হইল, তাঁহার এত কষ্টে সঞ্চিত গহনাগুলা কৈলাসীর গায়ে উঠিয়া তাঁহার সকল কষ্ট, সকল শ্রম সার্থক করিয়া দিয়াছে।

চাহিতে চাহিতে সহসা যেন দত্তজার চৈতন্য হইল। তিনি তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিলেন, "এবার তুই যেতে পারিস্ কৈলাসী।"

কৈলাসী কি বলিবে, কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

দত্তজা সিন্দুকটা পুনরায় বন্ধ করিয়া বলিলেন, "তোর বাবাকে বলিস, তোর বুড়ো বর সাধ্যমত তোকে সাজিয়ে দিয়েছে। এখন সে তোকে যে শালার হাতে ইচ্ছা তুলে দিতে পারে, আমার তাতে একটুও আপশোষ নাই।"

দরজার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তিনি কৈলাসীকে চলিয়া যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। কৈলাসী নীরবে যন্ত্রচালিতের ন্যায় ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল।

ভজহরি বাহিরে গো-সেবায় নিযুক্ত ছিল; অলঙ্কারের শব্দে চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিতেই কৈলাসীকে দেখিয়া বিস্ময়ে অভি-

ভূত হইল। তারপর তাহার বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টির সম্মুখ দিয়া কৈলাসা চলিয়া গেলে সে ছুটিয়া দত্তজার নিকট আসিল, এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হ্যাদে কত্তা, মেয়েটাকে গয়না-গুলো দিলে নাকি ?"

দত্তজা বলিলেন, "দূর হতভাগা, মেয়েটা কে ? ও যে আমার ক'নে।"

ভজহরি হাঁ করিয়া প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমাকে চেনা দায় কত্তা, এই তুমি বিয়ে করবে না। আমাকে মোট ঘাট বাঁধতে, গাড়ী পর্য্যন্ত ঠিক কত্তে বললে।"

মুখ খিঁচাইয়া দত্তজা বলিলেন, "বলেছি, আমার খুব অপরাধ হ'য়েছে। এখন পরাণ মাইতি, আর সেধো কলুকে একবার ডাক দেখি। বেটারা আজ সাতদিন ভাঁড়াভাঁড়ি কচ্চে।"

ভজহরি একটু গুম হইয়া থাকিয়া বলিল, "গরুটাকে খাবার দিয়ে যাচ্চি।"

ভজহরি প্রস্থানোদ্যত হইল। দত্তজা তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "হাঁরে ভজা!"

ভজহরি ফিরিয়া দাঁড়াইল। দত্তজা বলিলেন, "সে দিন যারা বলছিল না, মানুকে ছোঁড়াকে কোথায় দেখেছে ?"

তাঁহার মুখের উপর তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া ভজহরি উত্তর দিল, "চাঁদপুরে। কেনে ?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া দত্তজা বলিলেন, "না, কিছু নয় ; আমি

বলছিলাম, একবার যদি গিয়ে দেখে আস্‌তে পারিস, এখনো সেখানে আছে কি না।"

ভজহরি শ্লেষপূর্ণকণ্ঠে বলিল, "কেনে, ডেকে আনতে হবে নাকি?"

"না না, ডাকতে যাবি কেন? শুধু খবরটা নিয়ে আসা, কোথায় আছে।"

"যদি সেখানে থাকে?"

"থাকে থাকবে। যদি দেখাই হয়, তবে বুঝলি কি না, শুনিয়ে দিয়ে আসবি যে, আমরা ডেরা ডাণ্ডা তুলে চল্‌লাম।"

"আজি যাব নাকি?"

"না না, আজ আর কখন যাবি। কাল সকালে যখন সুবিধা হয়, বুঝলি কি না, এই তো দেড় কোশ রাস্তা, যাবি আর আস্‌বি।"

"আচ্ছা" বলিয়া ভজহরি কর্ত্তার মুখের উপর তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক স্বকার্য্যে প্রস্থান করিল।

একটু পরে দত্তজা গোশালার নিকট আসিয়া ডাকিলেন, "ভজা, ভজা!"

জাবনা মাখিতে মাখিতে ভজহরি উত্তর দিল, "কেনে?"

দত্তজা বলিলেন, "না না, তার খোঁজে আর যেতে হবে না। আমার খোঁজ কে রাখে, আমি যাব সেই হতভাগা ছোঁড়াকে খুঁজতে। চুলোয় যাক, যেতে হবে না, বুঝলি।"

ভজহরি উত্তর করিল, "আচ্ছা।"

১৮

সারা দিনের গুমোটের পর শেষ বেলায় খুব মেঘ উঠিল। মেঘের সঙ্গে সঙ্গে ঝড় আসিয়া মেঘটাকে উড়াইয়া দিল। বৃষ্টি খুব সামান্যই হইল, কিন্তু আকাশ পরিষ্কার হইল না; একটা ঘোলাটে মেঘে আকাশটা ঢাকিয়া রাখিয়া অপরাহ্নকে নিতান্ত নিরানন্দময় করিয়া তুলিল। দত্তজা খাতা দেখিতে দেখিতে দৃষ্টিটা তুলিয়া এক একবার সেই থমথমে প্রকৃতির দিকে চাহিতেছিলেন। এমন সময় পরাণ মাইতি ও সাধন কলু উপস্থিত হইল। ইহারা দত্তজার খাতক। দত্তজা ইহাদের নামে নালিশ রুজু করিয়াছিলেন। শমন জারির পর মোকদ্দমার দিন পড়িয়াছিল।

দত্তজা পরাণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কি হে পরাণ, টাকাগুলো মিটিয়ে দেবে, না আদালতে গিয়ে জবাব দেবে এক পয়সা ধারি না?"

পরাণ সবিস্ময়ে বলিল, "সে কি কথা কত্তা মশাই, তোমার টাকা ধারে না এমন কথা গাঁয়ের ক'টা লোক সাহস ক'রে কইতে পারে।"

দত্তজা বলিলেন, "কেউ কেউ বলে তো। তাই জিগ্যেস্ কচ্চি, তোমরাও এই সোজা কথাটা বলবে কি না।"

দন্তে জিহ্বা দংশন করিয়া যেন অতিমাত্র ভীতভাবে পরাণ বলিল, "এমন কথা কইবেন না কত্তা। যে বলে বলুক, কিন্তু আমরা গরীব মানুষ, কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে ঘর করি; আমরা কি

এমন অধর্ম্ম কত্তে পারি কত্তা। হাত পেতে টাকা নিয়েছি, এখন ধারি না বল্‌লে জিভটা যে খসে যাবে।”

তাহার এই ধর্ম্মনিষ্ঠা শ্রবণে ঈষৎ হাসিয়া দত্তজা বলিলেন, “বাপু, অধর্ম্ম তো কত্তে পার না, কিন্তু আজ তিন বছর হ’লো চল্লিশ টাকা নিয়েছ, এ পর্য্যন্ত তার ক’টা পয়সা দিয়েছ ?”

সপ্রতিভভাবে পরাণ বলিল, “সে কথা কইতে পারো কত্তা, কিন্তু দেখচো তো, ছিলে পিলে নিয়ে খেতেই পাই না, তার মহাজনকে কি দেব ?”

রুক্ষস্বরে দত্তজা বলিলেন, “ফাঁকি দেবে। বাপু, টাকা নেবার সময় কি এই রকম করার ক’রে নিয়েছিলে যে, খেয়ে দেয়ে যদি কিছু বাঁচে তো দেব ?”

পরাণ ইহার উত্তর দিতে না পারিয়া মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে লাগিল। দত্তজা বলিলেন, “বাপু, ধর্ম্মজ্ঞান যে সবার আছে তা আমি জানি; আর সুদখোর মহাজনদের মত অধার্ম্মিক যে দুনিয়ায় আর নাই এটা তোমরাও বেশ জেনেছ। চুলোয় যাক ধর্ম্ম অধর্ম্ম, এখন সুদ আসলগুলো ফেলে দিয়ে আমাকে আদালতে হাঁটাহাঁটির দায় থেকে রেহাই দেবে কি না বল দেখি। তুমি কি বল হে সাধন !”

সাধন হাতে হাত ঘষিতে ঘষিতে বলিল, “তা বই কি কত্তা, দেনা কড়ি ফেলে দিলে কেউ এক কথা বলতে পারে না।”

খাতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া দত্তজা বলিলেন, “তোমার হ’য়েছে কত জান, আসল তিরিশ, আর সুদ হচ্চে একুশ টাকা তেরো

আনা। মোটের উপর একান্ন টাকা তেরো আনা। এখন ভালোয় ভালোয় যদি ফেলে না দাও, তবে শেষটায় মোকদ্দমার খরচ এর উপর চাপবে।"

সাধন বলিল, "তা হ'লে গরীবের গলায় পা দেওয়া হবে কত্তা। আর তিনটে মাস যদি সময় দাও—"

দত্ত। তিন বচ্ছরে হ'লো না, তিন মাসে কি করবে শুনি?

সাধন। সরষে ক' বস্তা কিনে ফেলেছি। প্রায় দশ গণ্ডা টাকা আটক পড়েছে। এটা বেচে কিনে কতক ফেলে দিতে পারবো।

দত্ত। কিন্তু তোমার বেচতে কিনতে আমার যে সব বিকিয়ে যায়। তিন মাস পরে যখন কাল এসে আমার ঘাড় চেপে ধরবে, তখন তোমাদের সুদ আসল নিয়ে আমার কি হবে বল তো?

সাধন একটু ভাবিয়া বলিল, "যাই হোক কত্তা, এমন সময় টাকা কিন্তু কিছুতেই দিতে পারবো না।"

ভ্রূকুটী করিয়া দত্তজা বলিলেন, "সহজে না দাও, আদালতের পেয়াদা এসে ঢোল পিটলে দিতে পথ পাবে না।"

কাঁদ-কাঁদ মুখে পরাণ বলিল, "দোহাই কত্তা, তার চাইতে গলায় পা দিয়ে দাঁড়াও।"

দত্তজা বলিলেন, "গলায় পা দিলে তো আমার টাকা আদায় হবে না।"

সাধন বলিল, "তবে আমাদের কাচ্চা বাচ্চা গুলোর গলায় পা দিলেই কি টাকা আদায় হবে?"

ক্রোধে চীৎকার করিয়া দত্তজা বলিলেন, "হাঁ হবে। আমি সবার গলায় পা দিয়েই বেড়াচ্চি, না? আমি এমনি নিষ্ঠুর, এমনি চামার?"

পরাণ বা সাধন ভয়ে কোন উত্তর করিতে পারিল না।

দত্তজা রোষক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিলেন, "আচ্ছা, আজ হ'তে এই চামারগিরিতে ইস্তফা। এই নে তোদের দেনা, এই নে তোদের পাওনা।"

বলিয়া তিনি সম্মুখপতিত কয়েকখানা তমশুক ও হাতচিঠা টানিয়া লইলেন, এবং দাঁতে দাঁত চাপিয়া সেগুলাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন; তার পর সেই ছিন্ন খণ্ডগুলাকে পরাণ ও সাধনের গায়ে ছুঁড়িয়া দিয়া ক্রোধরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "কেমন, এবার দেনা পাওনা সব শেষ হ'লো তো?"

উভয়ে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া দত্তজার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

দত্তজা রোষগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আচ্ছা, সুদখোর গোবিন্দ দত্ত তো চল্‌লো, কিন্তু দেখবো, এবার কোন্ বেটা ধর্ম্মঠাকুর হাত পাতলেই বিনা সুদে টাকা ধার দেয়।"

তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া গভীর বিস্ময় অনুভব করিতে করিতে পরাণ মাইতি ও সাধন কলু প্রস্থান করিল, এবং পথে যাইতে যাইতে দত্তজা হঠাৎ পাগল হইয়া গিয়াছে কি না ইহা আলোচনা করিতে লাগিল। দত্তজা তাহাদের সে সমালোচনা শুনিতে পাইলেন না; তিনি উদাস দৃষ্টিতে থমথমে আকাশের দিকে

চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। বাতাসে হাতচিঠার ছিন্ন খণ্ডগুলা উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল।

এমন সময় ভজহরি আসিয়া বলিল, "গাড়ী ঠিক ক'রে এলুম কত্তা, কেনা মোড়ল ভোর ভোর গাড়ী নিয়ে আসবে।"

দত্তজা উদাসগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আচ্ছা।"

ভজহরি আর কিছু না বলিয়া তামাক সাজিতে গেল। সে তামাক সাজিয়া আনিয়া কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করিল, "গাড়ীতে যেতে কতক্ষণ লাগে কত্তা?"

দত্তজা বলিলেন, "কতক্ষণ কি রে, এত রাত এক দিন।"

উৎফুল্লস্বরে ভজহরি বলিল, "এক রাত এক দিন! খুব গাড়ী চড়া হবে কত্তা।"

একটু রুক্ষস্বরে দত্তজা বলিলেন, "হাঁ, গাড়ী চড়ে আমোদ কত্তেই যাওয়া কি না।"

ঈষৎ সলজ্জভাবে ভজহরি বলিল, "তা নয়, তবু 'মাসীর মায়ের যাত্রায় গঙ্গাস্নান লাভ' হবে তো!"

বলিয়া সে হাসিতে হাসিতে দত্তজার হাতে হুঁকা দিয়া বলিল, "কাশীতে কি ঠাকুর আছে কত্তা?"

"বিশ্বেশ্বর।"

"সে কেমন ঠাকুর?"

"শিব ঠাকুর কেমন হয়? আমাদের গাঁয়ের বুড়ো শিব কখন দেখিস্ নাই?"

ভজহরি মনে করিয়াছিল, কাশী যখন এত বড় একটা তীর্থ-

স্থান, এবং লোকে এত টাকা খরচ করিয়া সেখানে যায়, তখন সেখানকার ঠাকুর না জানি কি অদ্ভুত হইবে। কিন্তু সেখানে এই বুড়া শিবের মতই ঠাকুর শুনিয়া সে যেন অনেকটা হতাশ হইয়া পড়িল, এবং একটু অপ্রফুল্লভাবে বলিল, "এই রকম! তবে কি কত্তে লোকে এত টাকা খরচ ক'রে সেখানে যায় কত্তা?"

তাহার এই অজ্ঞতায় যেন নিতান্ত বিরক্ত হইয়া দত্তজা বলিলেন, "তোর বাবার শ্রাদ্ধ কত্তে যায়। আরে বেটা চাষা, স্থানমাহাত্ম্য আছে যে। তিনি হলেন কাশীর বিশ্বেশ্বর, আর এ হলো তোদের বেল পুকুরের বুড়ো শিব।"

"শিব তো বটে।"

"তুই বেটা ভজা মাইতি, আর কুলডাঙ্গার জমিদার ভজহরি সিং, দু'জনেই কি সমান?"

ভজহরি ইহার কি উত্তর দিবে স্থির করিতে না পারিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল। দত্তজা বলিলেন, "পুরুত ঠাকুরের আসবার কথা ছিল, এখনো তো এলো না। একবার দেখ্ দেখি। মা লক্ষ্মীর একটা বন্দোবস্ত ক'রে যেতে হবে। ঠাকুর তো ফেলে দিয়ে যেতে পারবো না।"

ভজহরি বলিল, "নিজেই যখন সব ছেড়ে ছুড়ে চললে কত্তা, তখন নক্ষী নিয়ে আর তোমার হবে কি?"

অতিমাত্র আশ্চর্য্যান্বিতভাবে দত্তজা বলিলেন, "তুই বলিস্ কি রে ভজা, নিজে যাচ্চি ব'লে মা লক্ষ্মীকে ফেলে দিয়ে যাব? মায়ের কৃপাতেই সব। যেথানেই যাই, যেথানেই থাকি, মাকে

ফেলতে পারবো না। আগে মায়ের বন্দোবস্ত ক'রে তবে যেতে হবে।"

ভজহরি বলিল, "তা তো ক'রে যাবে, কিন্তু তুমি চলে গেলে পুরুত ঠাকুর যদি ফেলে দেয়?"

উষ্ণভাবে দত্তজা বলিলেন, "ফেলে দেবে বললেই দেবে। পাকা বন্দোবস্ত ক'রে যাব না? মায়ের নামে এক বিঘে জমি দিয়ে যাব। ঐ মনসা তলার গায়ে যে জমিটা, ঐটার আয়ে মায়ের পূজো হবে। তুই এখন পুরুত ঠাকুরকে ডাক দেখি।"

শুক্লপক্ষ হইলেও মেঘের আবরণ ভেদ করিয়া জ্যোৎস্নার আলো ফুটিতে পারে নাই। সুতরাং ভজহরি ভাঙ্গা লণ্ঠনটা বাহির করিয়া আলো জ্বালিতে উদ্যত হইল। দেখিয়া দত্তজা বলিলেন, "এই সন্ধ্যা বেলা, দিব্যি ফরসা আছে, আলো কেন?"

ভজহরি বলিল, "বড্ড আঁধার কত্তা। এদিকে আলোর তেমন দরকার না হ'লেও ঐ গয়লা পাড়াটায় বাঁশ ঝাড়গুলোর নীচে দিয়ে যেতে হয়—"

দত্তজা একটু রুষ্টস্বরে বলিলেন, "সেখানে অন্ধকারে ভূত ব'সে আছে, তোকে খেয়ে ফেল্‌বে।"

ভজ। ভূত না থাক, রাত্তির কাল, লতা টতা তো থাকতে পারে।

ধমক দিয়া দত্তজা বলিলেন, "আচ্ছা আচ্ছা, তুই খুব বাহাদুর। থাক্, এই তিন পা রাস্তা যেতে এক পয়সার তেল পুড়িয়ে আসতে হবে না। আমি নিজে যাচ্ছি।"

ভজহরি বিরক্তভাবে লণ্ঠনটা ঠুকিয়া রাখিয়া বলিল, "রাগ কর কেনে কত্তা, আঁধারেই না হয় যাচ্চি। কিন্তু আমি আধ পয়সার তেল পোড়ালেই কি এত খরচ হয়ে গেল? আর এই যে হাতে হাতে তুমি কতগুলো গয়না বিলিয়ে দিলে, কতগুলো টাকা ছেড়ে দিলে?"

ভজহরির স্বরটা অভিমানে গাঢ় হইয়া আসিল। দত্তজা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "এই বেটা কাঁদুনি গাইতে আরম্ভ করলে। আরে বেটা চাষা, দু'শো পাঁচ শো, দু'হাজার পাঁচ হাজার বিলিয়ে দেব, তাই ব'লে আধ পয়সা বাজে খরচ করবো কেন? মানুষ উচ্ছন্নে যায় কিসে জানিস্, এই বাজে খরচে। আজ আধ পয়সা, কাল এক পয়সা, পরশু পাঁচ পয়সা, এমনি ভাবে বাজে খরচ করলে লক্ষ্মী ছেড়ে লক্ষ্মীর বাবা যে ছুটে পালাবে। গয়না টাকাগুলোর কথা বলচিস্? গয়নাগুলো তো পরের ধন, পাঁচ টাকায় পঞ্চাশ টাকার জিনিস নিয়েছি। ঐ ভূতের বোঝা ঘাড়ে ক'রে কোথায় ঘুরবো বল্ দেখি। তার চাইতে মেয়েটাকে দিয়ে ফেললাম। ও তো ভুলেও একবার নাম করবে, দাদামশায় এগুলো দিয়েছে। আর ঐ প'ড়ো টাকাগুলো কি আদায় হ'তো মনে করিস্? দশ বছরেও দশটা পয়সা পাওয়া যেতো না। তার চাইতে সব ছেড়ে দিলাম ব্যস, দেনা পাওনা মিটে গেল, পেছু টান আর রইলো না। বুঝেছিস্?"

বলিয়া দত্তজা ভজহরির দিকে সহাস্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

ভজহার কিন্তু এত কথা বুঝিল না, আলো না পাওয়ায় বিরক্ত ভাবে গজ গজ করিতে বাহির হইয়া গেল। দত্তজা চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

যাই যাই করিয়া এত দিন কাটিয়া গেল, কিন্তু আর কাটে না। আর একটা রাত্রি মাত্র, তার পর আশৈশব-পরিচিত এই গ্রাম, এই গৃহ, ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। সকালে উঠিয়া ঐ আমগাছটার পাতার ফাঁকে ফাঁকে প্রভাত-সূর্য্যের সুবর্ণচ্ছটা আর দেখা যাইবে না, ঐ যে ঘুঘুটা বাঁশ গাছের মাথায় বসিয়া প্রত্যহ একবার করিয়া ডাকে, উহার ডাক আর শ্রুতিগোচর হইবে না, এই যে সব পরিচিত মুখ, ইহাদের একটাও দেখা যাইবে না। উঃ, তীর্থবাসে পুণ্য যতই থাক, কষ্টও বড় কম নাই! সারা জীবনের পরিচিত এই সব ছাড়িয়া একটা অচেনা দেশে যাওয়া, ইহার অপেক্ষা কষ্ট আর কি আছে! দত্তজার বুকের ভিতর যেন মোচড় দিয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল।

উঃ, দেশত্যাগে কি ভয়ানক কষ্ট! যাহাদের সঙ্গে একটুও স্নেহ বা ভালবাসার বন্ধন আছে বলিয়া কখন মনে হয় নাই, তাহারা যে আজ এমন আত্মীয়তার সুদৃঢ় আকর্ষণে স্থির সঙ্কল্পবদ্ধ মনটাকে বিচলিত করিয়া তুলিবে ইহা কে জানিত। দেনার দায়ে তিনিই তো কত লোককে দেশত্যাগী করাইয়াছেন এবং তাহাদের মায়া-কান্না দেখিয়া কঠোর উপহাসের হাসি হাসিয়াছেন। চিনিবাস বাগের ঘর ভিটা যখন নীলাম করিয়া লওয়া হয়, তখন তাহার কি কান্না! সর্ব্বস্ব লইয়া শুধু ভিটাটুকুতে থাকিতে

দিবার জন্য সে পা দুইটা জড়াইয়া কি কান্নাই কাঁদিয়াছিল। তখন কে তাহার ক্রন্দনে কর্ণপাত করিয়াছিল; অন্তরের কি গভীর বেদনায় তাহার চোখ দিয়া জল বাহির হইয়াছিল তাহা কে বুঝিয়াছিল। আর আজ নিজের বুকে সেই গভীর বেদনা লইয়া দেশত্যাগ করিতে হইবে ইহাই বা কে জানিত? ভগবান, তোমার রাজ্যে পাপের শাস্তি আছেই। যে বলে ইহ-কালের পাপের শাস্তি পরলোকে ভোগ করিতে হয়, সে হয় নিষ্পাপ, নয় মিথ্যাবাদী। বেদনার গুরুভারে দত্তজার বুকটা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল।

হঠাৎ মনে হইল, রমানাথকে এখনও স্পষ্ট কোন কথা বলা হয় নাই, সে নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে বিবাহের আয়োজনে ব্যস্ত রহিয়াছে। তাহাকে কোন কথা না বলিয়া হঠাৎ চলিয়া যাওয়া ভাল দেখায় না, ইহাতে তাহাকে ভয়ানক বিপন্ন করা হইবে। সংসারে আসিয়া লোকের অভিশাপ বড় কম কুড়ান হয় নাই; যাইবার সময় তাহার পুনরভিনয় কেন?

দত্তজা উঠিয়া চাদরখানা কাঁধে ফেলিলেন এবং ঘরে চাবী দিয়া বাটীর বাহির হইলেন।

১৯

রমানাথের বাড়ীর দরজায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বাড়ীর বাহিরের দরজা বন্ধ। দরজার পাশেই বাহিরের ঘর। ঘরে আলো জ্বলিতেছে, খোলা জানালা দিয়া আলোকরেখা বহির্গত

হইয়া বাহিরের অন্ধকারময় স্থান কতকটা উজ্জ্বল করিয়াছে। দত্তজা দরজা ঠেলিয়া রমানাথকে ডাকিতে গেলেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন, বাহিরের ঘরে বসিয়া কে সুরের সহিত রামায়ণ পাঠ করিতেছে। কণ্ঠস্বরটা কৈলাসীর না? হাঁ, তাহারই গলা বটে। রমানাথকে না ডাকিয়া দত্তজা উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলেন, কৈলাসী পড়িতেছে—

"কৈকেয়ীর বচনেতে বুকে শেল ফুটে।
চেতন পাইয়া রাজা ধীরে ধীরে উঠে॥
মুখে ধূলা উঠে রাজা কাঁপিছে অন্তরে।
হতজ্ঞান দশরথ বলে ধীরে ধীরে॥
পাপীয়সী আমারে বধিতে তোর আশ।
স্ত্রীপুরুষ যত লোক কহিবে কুভাষ॥
রাম বিনা আমার নাহিক অন্য গতি।
আমারে বধিতে তোরে কে দিল এ মতি॥
স্বামী বধ করিয়া পুত্রেরে দিলি রাজ্য।
চণ্ডাল হৃদয় তোর করিলি কি কার্য্য॥
এই কথা যত্যপি ভরত আসি শুনে।
আপনি মরিবে কি মারিবে সেইক্ষণে॥
বিষদন্তে দংশিলি রে কাল ভুজঙ্গিনী।
তোরে ঘরে আনিয়া যে মজিনু আপনি॥
কোন্ জন আছে হেন কমিনীর বশ।
কামিনীর কথাতে কে ত্যজিবে ঔরস॥

পরমায়ু থাকিতে বধিলি মম প্রাণ।
পায়ে পড়ি কৈকেয়ী করহ প্রাণদান॥"

উঃ, বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রীর বশ হওয়া কি ভয়ানক! এই জন্যই বলে বৃদ্ধস্য যুবতী ভার্য্যা। দশরথের মত এত বড় একজন রাজাকেও ইহার বিষময় ফল ভোগ করিতে হইয়াছে, অপর লোক কোন্ ছার! বিশ্বনাথ! এই ঘৃণিত মোহ হইতে অব্যাহতি দাও।

দত্তজা সরিয়া গিয়া জানালার সামনে দাঁড়াইলেন। জানালার অল্প দূরেই তক্তাপোষের উপর কৈলাসী বসিয়াছিল। দেওয়ালে চিমনীর আলো জ্বলিতেছিল; তাহার তীব্র জ্যোতি আসিয়া কৈলাসীর মুখের উপর পড়িয়াছিল। দত্তজার মনে হইল, যেন খানিকটা চাঁদের আলো আসিয়া একরাশ ফুটন্ত ফুলকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। কৈলাসী পড়িতে পড়িতে আস্তে আস্তে দুলিতেছিল, তাহাতে কাণের দুল দুইটা, নোলকের মুক্তাটা দুলিয়া দুলিয়া তাহার গণ্ডে ওষ্ঠে একটা উজ্জ্বল জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছিল। সে দুল, সে মুক্তা দত্তজা নিজেই কৈলাসীকে দিয়াছিলেন। অনিমেষ দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া দত্তজা স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কৈলাসী আপন মনে পড়িয়া যাইতে লাগিল—

"কৈকেয়ীর পায়ে রাজা লোটে ভূমিতলে।
সর্ব্বাঙ্গ তিতিল তার নয়নের জলে॥
অধিবাস রামের হইবে সবে জানে।
কি করিয়া দাণ্ডাইব সভা বিগুমানে॥

ক্ষমা কর কৈকেয়ী করহ প্রাণ রক্ষা।
নিজ সোহাগের তুমি বুঝিলে পরীক্ষা॥
স্ত্রীবাধ্য না হয় কেহ আমার এ বংশে।
তোর দোষ নহে আমি মজি নিজ দোষে॥
স্ত্রীবশ যে জন হয় তার সর্ব্বনাশ।
গাইল অযোধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস॥"

দত্তজার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল। তিনি ত্বরিতপদে জানালার সম্মুখ হইতে সরিয়া আসিলেন এবং দরজার কাছে আসিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। একবার মনে হইল, দরজা ঠেলিয়া রমানাথকে ডাকেন। কিন্তু ডাকিতে গিয়াও ডাকা হইল না; ডাকিলে পাছে কৈলাসী আসিয়া দরজা খুলিয়া দেয়। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া দত্তজা এক এক পা করিয়া জানালার দিকে অগ্রসর হইলেন। যাইতে যাইতে একবার থমকিয়া দাঁড়াইলেন, আবার পা টিপিয়া টিপিয়া জানালার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

কৈলাসী তখন বই মুড়িয়া জানালার দিকে চাহিয়াছিল। দত্তজা তাহার দৃষ্টির সম্মুখে গিয়াই যেন একটু জড় সড় হইয়া পড়িলেন। কৈলাসী আলোতে বসিয়াছিল, সুতরাং বাহিরে অন্ধকারের মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। দত্তজার কিন্তু মনে হইল, কৈলাসী তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছে, এবং দেখিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছে। সর্পীর উজ্জ্বল দৃষ্টি দর্শনে শিকার যেমন ভয়ে ভয়ে পশ্চাৎপদ হয়, কৈলাসীর তীব্র দৃষ্টিতে ভীত হইয়া

দত্তজা সেইভাবেপিছু হটিতে লাগিলেন, এবং জানালা হইতে একটু দূরে আসিয়াই দ্রুতপদে গৃহাভিমুখী হইলেন!

কিছু দূর আসিতেই হঠাৎ রমানাথের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহাকে দেখিয়া দত্তজা যেন একটু সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন। রমানাথ কিন্তু তাহা লক্ষ্য না করিয়া বলিয়া উঠিল, "এই যে খুড়ো। আমি তোমার কাছে যাব মনে করেছিলাম। খবরটা শুনেছ?"

কৌতূহলের সহিত দত্তজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের খবর?"

রমানাথ বলিল, "গাঁ শুদ্ধ চাউর হ'য়ে গেল, তুমি এখনো শোন নি? দাশু ঘোষের বিধবা মেয়েটা যে পালিয়েছে।"

বিস্ময়-জড়িতকণ্ঠে দত্তজা বলিয়া উঠিলেন, "এঁ্যা!"

রমানাথ বলিল, "মেয়েটার স্বভাব চরিত্র এদানী নাকি খুব খারাপ হ'য়েছিল। মাণিকের সঙ্গে খুবই জড়িয়ে পড়েছিল। দাশু সেটা জানতে পেরে মাণিককে তিরস্কার করে। এই কারণেই নাকি মাণিক পালিয়েছে। তার পর আজ সন্ধ্যার সময় মেয়েটা বড় পুকুরে জল আনতে যায়, আর ফেরে নি।"

দত্ত। কিন্তু পালিয়েছে তার প্রমাণ কি? জল আনতে গিয়ে জলে ডুবে মত্তেও তো পারে।

রমা। জলে মোটেই নামে নি, ডুববে কোথা হ'তে? কলসীটা পুকুরের পাড়ের উপর বসানো আছে, তার পাশে শুক্নো গামছাখানা পড়ে রয়েছে।

দত্তজা চিন্তিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রমানাথ বলিল, "পালিয়েছে যে এটা নিশ্চয়। অনেকেই বলছে—

কথাটা শেষ না করিয়াই রমানাথ থামিয়া গেল। দত্তজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "অনেকে কি বলছে?"

রমা। বলছে যে, এ কাজ মাণিকের। সে আগে হ'তে লোক দ্বারা পরামর্শ ঠিক ক'রে রেখে চুপে চুপে এসে ওৎ পেতে বসেছিল। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢেকে দু'জনে স'রে পড়েছে। ঘোষজারও তাই বিশ্বাস।

দৃঢ়কণ্ঠে দত্তজা বলিলেন, "মিথ্যা কথা।"

রমানাথ বলিল, "সত্য মিথ্যা ভগবান্ জানেন, মোদ্দা মেয়েটা কুলে কালি দিয়েছে। ঘোষজা তো মাথায় হাত দিয়ে ব'সেছে। কখন বলছে, চুলোয় যাক, তার আর খোঁজ আর করবো না; কখন বলছে, খুজে বের ক'রে ছোঁড়াকে জেলে দেব।"

"যেমন কর্ম্ম তেমন ফল।" তীব্রকণ্ঠে কথাটা বলিয়াই দত্তজা পাশ কাটাইয়া অগ্রসর হইলেন। রমানাথ বলিল, "শুনতে পাই, তুমি নাকি কাশী যাবার যোগাড়ে আছ খুড়ো?"

ব্যস্ততার সহিত দত্তজা বলিলেন, "না না, ও সব বাজে কথা।"

বলিয়া তিনি সত্বরপদে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। রমানাথ চিন্তিতভাবে বাড়ীর দিকে চলিল।

বাড়ীতে আসিয়া দত্তজা দেখিলেন, ভজহরি তখনও ফিরে নাই। তাহার উপর বিরক্তি প্রকাশ করিতে করিতে তিনি

দরজা খুলিয়া ঘরে আলো জ্বালিলেন এবং হুঁকা কলিকা লইয়া তামাক সাজিতে বসিলেন। হঠাৎ বাহিরের দরজাটা এমন জোরে খুলিয়া গেল যে, তাহার শব্দে দত্তজা চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার সে চমকিত ভাব অন্তর্হিত না হইতেই মাণিক ডাকিল, "দাদামশায়!"

অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে হঠাৎ হারানো জিনিষটা হাতে ঠেকিলে লোক যেমন আনন্দে লাফাইয়া উঠে, মাণিকের কণ্ঠস্বর শ্রবণে দত্তজাও তেমনি আনন্দে লাফাইয়া উঠিলেন। কিন্তু হঠাৎ একটা কথা মনে আসিলে তিনি আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া একটু গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কে, মাণিক?"

"হাঁ দাদামশায়" বলিল মাণিক দাবার উপর বসিয়া পড়িল।

দত্তজার প্রশ্নের উত্তরে মাণিক বলিল, মাসের শেষে তাঁহার বিবাহ হইবে শুনিয়া মজা দেখিবার জন্য সে যাত্রার দলে ছুটি লইয়াছিল, এবং আহারাদির পর এখানে রওনা হইয়াছিল। পথে মেঘ দেখিয়া গোপালপুরে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে এবং মেঘ কাটিয়া গেলে পুনরায় রওনা হয়। ইহাতে পথে সন্ধ্যা হইয়া যায়। সন্ধ্যার অন্ধকারে সে যখন বেল পুকুরের মাঠের মাঝামাঝি বড় পুকুরটার নিকট উপস্থিত হয়, তখন সহসা কোন স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ শ্রবণে সেই দিকে ছুটিয়া যায় এবং গিয়া দেখে, দুই জন দুর্ব্বৃত্ত একটী স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচারের চেষ্টা করিতেছে। পুকুরের পাড়ের নীচে শ্মশান ছিল। সেই শ্মশান হইতে একটা আধপোড়া বাঁশ লইয়া সে দুর্ব্বৃত্তদ্বয়কে আক্রমণ করে। তাহারা

হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া ভয়ে পলাইয়া যায়। তারপর সে স্ত্রীলোকটীর নিকট গিয়া দেখে, সে আর কেহ নহে, দাশু ঘোষের মেয়ে রুক্মিণী। অতঃপর সে রুক্মিণীকে সঙ্গে লইয়া গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে, এবং রুক্মিণীকে তাহাদের বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া এখানে আসিয়াছে।

রুক্মিণীর পলায়ন ব্যাপারটা এতক্ষণে দত্তজার নিকট স্পষ্ট হইয়া আসিল, এবং সেই সঙ্গে মাণিকের বীরত্বকাহিনীশ্রবণে গর্ব্বে আনন্দে তাঁহার বুকটা যেন ফুলিয়া উঠিল। তিনি মাণিককে আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে লোক দুটোকে চিনেছিস্?"

মাণিক বলিল, "খুব চিনেছি দাদামশায়, দক্ষিণ পাড়ার হরে গয়লা, আর রেমো বাগ্‌দী। কিন্তু চিনে কি হবে, ঘোষজা বুড়ো নালিস দরবার কত্তে রাজি নয়। বলে—মিছে কেলেঙ্কারী, পয়সা খরচ।"

দত্তজা জোর গলায় বলিলেন, "যত টাকা খরচ হয় আমি দেব, পাষণ্ড দু'বেটাকে জব্দ কত্তেই হবে। নইলে তোর কলঙ্ক দূর হবে না।"

২০

দত্তজার সে যাত্রা কাশী যাওয়া হইল না; তিনি দাশুকে অনেক বুঝাইয়া তাহার দ্বারা হরি গয়লা ও রামু বাগদীর নামে মোকদ্দমা রুজু করাইলেন। তাঁহার চেষ্টার সাক্ষী সাবুদের

অভাব হইল না। তিন মাস মোকদ্দমা চলিবার পর আসামীরা সাজা পাইল; তাহাদের আট মাস করিয়া জেলের হুকুম হইল। অনেকে দত্তজাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

পরের জন্য সুদখোর গোবিন্দ দত্তকে এতগুলা টাকা খরচ করিতে দেখিয়া অনেকে আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তাহারা স্থির করিয়া লইল, ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই গোবিন্দ দত্তের স্বার্থ আছে। উহার সুদের সুদ ছোঁড়াটার সহিত রুক্মিণীর যে একটা অবৈধ সম্বন্ধ জন্মিয়াছে, সেই সম্বন্ধের অনুরোধেই গোবিন্দ দত্ত এতগুলা টাকা খরচ করিয়া ফেলিল। নতুবা যে এক পয়সায় মরে বাঁচে, দাশু ঘোষের মেয়ের জন্য তাহার এমন কি মাথা ব্যথা যে, চার পাঁচ শত টাকা খরচ করিতে পারে।

এইরূপ ধারণার ফলে আসামীরা সাজা পাইলেও রুক্মিণীর চরিত্র সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান হইয়া রহিল। তা ছাড়া যাহারা রুক্মিণীকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহারা উহার ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছে কি না এবিষয়েও মতভেদ উপস্থিত হইল। সুতরাং এই চরিত্রহীনা পরপুরুষস্পৃষ্টা রমণীকে সমাজে গ্রহণ করা সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইল না, এবং কন্যাকে গৃহে স্থান দিলে দাশুকে যে সমাজচ্যুত হইতে হইবে, পাঁচজনে এমন ভয়ও দেখাইল। দাশু মেয়েটাকে লইয়া কি করিবে তাহাই ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। দত্তজাও রুক্মিণীর পরিণাম ভাবিয়া চিন্তিত হইলেন।

মাণিক যুক্তি দিল, "এক কাজ কর দাদামশায়, বিধবার বিয়ে তো আজ কাল চল্‌তি হয়েছে, রুক্মিণীর না হয় বিয়ে দাও।"

দত্তজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিয়ে করবে কে ?"

মাণিক বলিল, "আমি করবো।"

দত্তজা হাসিয়া উঠিলেন ; বলিলেন, "আর কৈলাসী কি মালা হাতে ভিক্ষা ক'রে খাবে ?"

মাণিক একথার উত্তর দিতে না পারিয়া নিরস্ত হইল। দত্তজাও আপাতত রুক্মিণীর চিন্তা হইতে বিরত হইয়া সত্বর মাণিকের বিবাহের আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন।

দাশু কিন্তু মেয়েটাকে লইয়া বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িল। রুক্মিণীকে ঘরে রাখায় পাঁচজনে তাহাকে সমাজচ্যুত করিবে বলিয়া ভয় দেখাইতে লাগিল। গ্রামে তাহার মুখ দেখান যেন ভার হইয়া উঠিল। রাইচরণ লোকের নিন্দা গ্লানিতে অসহিষ্ণু হইয়া বলিল, "ওকে এই মুহূর্ত্তে বাড়ী হইতে তাড়াও, নয় তো আমি দেশত্যাগী হব।"

কিন্তু তাড়াইয়া দিলে মেয়েটা যায় কোথায় ? পিতাপুত্রে অনেক ভাবিয়া স্থির করিল, কলিকাতায় দাশুর মামাতো ভায়ের এক শ্যালক সপরিবারে থাকে ; রুক্মিণীকে আপাততঃ সেইখানেই রাখা হউক।

এই পরামর্শ অনুসারে রাইচরণ ভগ্নীকে লইয়া কলিকাতায় যাত্রা করিল। বিবাহের জন্য দত্তজার কতকগুলা কাপড় ও অন্যান্য জিনিষ কিনিবার প্রয়োজন ছিল। তিনি মাণিকের হাতে টাকা দিয়া তাহাকে উহাদের সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন।

তৃতীয় দিবসে মাণিকের ফিরিবার কথা। মাণিক কিন্তু সে

দিন ফিরিল না; চতুর্থ দিবসে তাহার একখানা চিঠি আসিল। চিঠীতে সে লিখিয়াছিল—

"দাদামশায়, যাদের কাছে রাখবার জন্য রুক্মিণীকে আনা হ'য়েছিল, তারা ঠাঁই দিলে না। আর এক জায়গায় তাকে রাখা যায়, যেখানে রাখলে সে সমাজের কালামুখে দু'হাতে চুণকালি লেপে দিতে পারবে। কিন্তু তার কতকটা চুণকালি নিজেদের মুখেও পড়বে ব'লে সেখানে রাখতে পারলাম না। কাজেই তাকে নিজের কাছে রাখবো ঠিক ক'রে ফেলেছি। রাইচরণেরও তাই মত। সে ভগ্নীকে হিন্দুমতে সম্প্রদান করবে। বিয়ের সব ঠিক হ'য়েছে, একখানা বাড়ী ভাড়া ক'রে আছি। এখন কিছু টাকার দরকার। তুমি সুদের সুদ খেয়ে অনেক পয়সা জমিয়েছ। তার মধ্যে শ' পাঁচেক টাকা দিলে বিয়েটা হ'য়ে যায়। এই দানে তোমার স্বর্গের দরজা মুক্ত না হোক, একটা নিরপরাধ মেয়েমানুষের নরকে যাবার পথের দরজা বন্ধ হবে। যদি টাকা পাঠাও, নীচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিও। আমার জন্য দুঃখ করো না। আমার সঙ্গে তোমার মাস কতক আগে কোনই সম্বন্ধ ছিল না, পরেও না থাকলে কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু টাকাটা না পাঠালে যে ক্ষতি হবে, তুমি হাজার বৎসর কাশীবাস করলেও সে ক্ষতির পূরণ হবে না জেনো। ইতি—

তোমার সুদের সুদ।"

পত্র পড়িয়া দত্তজা স্তম্ভিত হইলেন। একি, মাণিক বিধবা-বিবাহ করিবে? দত্তজা একবার দুইবার তিনবার পত্রখানা

পড়িলেন। না, অবিশ্বাসের কোনই কারণ নাই। হাতের লেখাটাও মাণিকেরই বটে। তেমনি তো বাঁকা বাঁকা কাঁচা লেখা। তাহা হইলে মাণিক নিশ্চয়ই রুক্মিণীকে বিবাহ করিবে। ওঃ, বিধাতার কি কঠোর পরিহাস! সে তো চলিয়াই গিয়াছিল; তিনিও নিজের পথ বাছিয়া লইয়াছিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ সে আসিয়া তাঁহার পথের সম্মুখে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীররূপে দণ্ডায়মান হইল কেন? সে না আসিলে তো তিনি উন্মূলিতপ্রায় আশা-লতাকে পুনরায় হৃদয়বৃক্ষে জড়াইয়া তুলিতেন না। সে আশা-লতায় যে শেষে এমন বিষময় ফল ফলিবে তাহা কে জানিত? সেই ফলের তীব্র জ্বালা অনুভব করিয়া দত্তজা স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন।

ভজহরি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কার চিঠি এলো কত্তা।"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দত্তজা বলিলেন, "মাণিকের।"

"কি লিখেছে?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দত্তজা বলিলেন, "লিখেছে, গঙ্গাতীরে আমার শ্রাদ্ধ করবে, তার দরুণ শ'পাঁচেক টাকা চাই।"

ভজহরি নির্ব্বাক্‌ভাবে কিছুক্ষণ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ছরাদে ষাঁড় দাগবে নাকি?"

দত্তজা বলিলেন, "ষাঁড় ছেড়ে মোষ পর্য্যন্ত দাগবে। দেখতে যাবি তুই?"

ঘাড় নাড়িয়া ভজহরি বলিল, "হুঁ।"

"তবে মোট ঘাট বেঁধে ফেল্ দেখি।"

"একেবারে মোট ঘাট বেঁধে যেতে হবে ?"

"ষাঁড় দাগার পর কি কেউ ফিরে আসে ?"

ভজহরি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দত্তজা বলিলেন, "শুন্‌তে পেয়েছিস্‌, মোট ঘাটগুলো তৎপর বেঁধে ফেল্‌।"

ভজহরি যেন একটু শ্লেষের স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি বাঁধবো কত্তা, না মিছিমিছি ?"

ভ্রূকুটী করিয়া দত্তজা বলিলেন, "এবার আর সত্যি মিছে নাই ভজা, যেতেই হবে এবার। দু'টোর গাড়ী ধরা চাই, বুঝলি ?"

ভজহরি মোটঘাট বাঁধিতে ব্যস্ত হইল। দত্তজা গিয়া রমানাথকে পত্রখানা দেখাইলেন, এবং কৈলাসীর জন্য অন্য পাত্র দেখিতে বলিয়া বিবাহের খরচ স্বরূপ পাঁচশত টাকা প্রদান করিলেন। তারপর মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই ঘর দরজায় চাবী দিয়া ভজহরির সহিত গাড়ীতে উঠিলেন। গ্রামবাসীদের বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টি অতিক্রমপূর্ব্বক গাড়ীখানা গ্রাম ছাড়াইয়া যখন মাঠে পড়িল, তখন দত্তজা বাষ্পভরা দৃষ্টিটাকে গ্রামের দিক হইতে ফিরাইয়া লইয়া গাড়ীর ভিতর শুইয়া পড়িলেন।

কলিকাতায় পৌঁছিয়া দত্তজা খুঁজিয়া খুঁজিয়া মাণিকের নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় উপস্থিত হইলেন। ছোট ভাড়াটে বাড়ী। বাড়ীতে তখন মাণিক বা রাইচরণ কেহই ছিল না। খানিক ডাকাডাকির পর রুক্মিণী আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল, এবং দত্তজাকে গাড়ী হইতে নামিতে দেখিয়া সে ভয়ে বিস্ময়ে যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল।

দত্তজা বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া বজ্রকঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই আবার বিয়ে করবি রুক্মিণী ?"

রুক্মিণী ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাঁহার রোষকঠিন মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার পায়ের উপর আছাড় খাইয়া পড়িল, এবং দুই হাতে তাঁহার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমাকে বাঁচাও জেঠামশাই, বিষ এনে আমাকে দাও, খেয়ে এ জ্বালার হাত হ'তে পরিত্রাণ পাই।"

দত্তজা হাত ধরিয়া তাহাকে তুলিলেন, এবং মৃদু কোমল হাসি হাসিয়া ধীর প্রশান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "আর বিষ খেতে হবে না মা, আমার সঙ্গে চল্। বুদ্ধির দোষে যদি একদিনের তরেও মনের ভিতর ময়লা দাগ লাগিয়ে থাকিস্, দু'দিন বিশ্বনাথের মাথায় জল ঢাল্‌লেই সে দাগ মুছে যাবে। বিশ্বনাথের আনন্দ-ধাম বারাণসী এই পৃথিবীটার বাইরে; সেখানে যদি আমার মত সুদখোর পাপীর স্থান হয়, তবে তোর মত পতিতাও নিরানন্দে থাকবে না।"

রুক্মিণী তাঁহার পায়ের ধূলা লইতে গিয়া চোখের জলে পা ভিজাইয়া দিল। ঘরের তাকে কাগজ পেন্‌সিল ছিল; তাহা লইয়া দত্তজা লিখিলেন—

"মাণিক চন্দর, সমাজচ্যুতা রুক্মিণীকে রাখবার মত জায়গা খুঁজে পাওনি, তাই তাকে নিজের কাছে রাখতে চেয়েছিলে। আমি তার চাইতেও ভাল জায়গায়—বিশ্বনাথের পায়ের কাছে রাখবার জন্য তাকে নিয়ে চললাম। তাতে তার বা আমার—

দুজনেরই স্বর্গের দরজা নিশ্চয়ই কেউ বন্ধ ক'রে রাখতে পারবে না।

আমি অনেক সুদ খেয়েছি বটে, কিন্তু কখন মেয়েমানুষের মাথা খাইনি। এখন আমি সুদের মায়া কাটিয়ে আসলের অন্বেষণে চলেছি, সুতরাং সুদের সুদের জন্য আমার আর একটুও দুঃখ নাই।

দাদামশায়।"

কাগজখানা মেঝের উপর ফেলিয়া রাখিয়া রুক্মিণীর হাত ধরিয়া দত্তজা গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী হাবড়া ষ্টেশনের দিকে ছুটিয়া চলিল। ভজহরি বলিল, "এ আবার কি করলে কত্তা?"

দত্তজা বলিলেন, "একটা রাঁধুনী সঙ্গে নিলাম রে ভজা, বুড়ো হ'য়েছি, আর কি রেঁধে দিতে পারি?"

উৎফুল্লভাবে ভজহরি বলিল, "বল কি কত্তা, তা হ'লে এবার পেটটা ভরে খেয়ে বাঁচা যাবে বল।"

কৃত্রিম কোপে ঠোঁট ফুলাইয়া দত্তজা বলিলেন, "বটে রে নিমকহারাম, এদ্দিন তোর কোন্ বাবা এসে রেঁধে খাইয়েছিল? আচ্ছা এই দিব্যি কচ্চি, এবার যদি তোকে এক বেলা রেঁধে খাওয়াই, তবে আমার নাম গোবিন্দ দত্তই নয়।"

দত্তজার উচ্চহাস্যধ্বনিতে গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দ ডুবিয়া গেল।

সম্পূর্ণ।

PUBLISHED BY G. B. DUTTA & S. C. PAUL.
114, Ahireetola Street Calcutta.
PRINTED BY KALACHAND DALAL.
KANTIK PRESS. 22, Sukea Street, Calcutta.